# সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা

সুব্রত গুপ্ত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬১

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : নিমাইচন্দ্র ঘোষ । দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স

৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

আমার মা

শ্রীযুক্তা অমিয়া গুপ্ত-কে

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যাদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্য ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি, তোমাব চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে জানোনি। তোমার এই চরিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

..........................................................................

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহুবৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক—কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## বিষয়সূচী

# ভূমিকা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। দেশের পূর্ণ স্বরাজের জন্য তাঁর বিরামহীন সংগ্রামের পাশাপাশি জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুভাষচন্দ্র জানতেন যে দেশ স্বাধীন হবার পর যে-জিনিসটি হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনভারতে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি-পর্ব চালানো জরুরী ছিল তার অনেক আগে। রাশিয়ায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হবার পর সে-দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা দেখে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা-মানসে যে পরিবর্তন আসে তার ভিত্তিতেই তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা পরিণতি লাভ করেছিল। এই বইয়ে সুভাষচন্দ্রের বহুমুখী সংগ্রামী জীবনের শুধু একটি দিকই আলোচিত হয়েছে। তা হল তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা। আক্ষরিক অর্থে সুভাষচন্দ্র অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে তাঁকে অর্থনীতি অধ্যয়ন করতে হয়েছিল—কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার পরিধি ছিল ব্যাপক। দেশের বহু বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এভাবে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা ভাবেননি বা ভাবতে পারেননি। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সেজন্য অর্থনীতির যে কোনো ছাত্রেরই পরিচিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা যে এখনও যথেষ্ট বেশী তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে।

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা আলোচনাকালে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা চলে আসে। মহাত্মা গান্ধী এবং গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে আলোচনা করতে হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কোনো পরাভবকেই মেনে নেননি। দেশের কল্যাণের জন্য যে ধরনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন, তার সঙ্গে কোনো আপস করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। আপসহীন নেতা সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পুরোধা—বর্তমান কালে হয়ত অনেকে এ জিনিস স্বীকার করবেন না। কিন্তু এজন্য ইতিহাস পাল্টাবে না। আমি সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, এবং দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য

দিয়ে যেতে হয়েছিল তারও উল্লেখ করেছি। আমার এই কাজে আমি কতটা সফল হয়েছি বইটির পাঠক-পাঠিকাগণই তা বিবেচনা করবেন। আমার এই আলোচনায় ত্রুটি থাকতে পারে—কারণ সুভাষচন্দ্রের মতো বিরাট ব্যক্তির কথা লিখতে যাওয়া আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাহসের ব্যাপার। তবুও যদি এই আলোচনার মাধ্যমে কিছু পরিমাণেও সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরতে পারি তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

এই বইটি লেখার প্রেরণা পেয়েছি বন্ধুবর শ্রী নন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। শ্রী মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের উপর নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কিত আলোচনার জন্য তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ ও চাপ আসার পর আমি একাজে হাত দিই। তাঁর কাছে এজন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইতিপূর্বে বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে আমার একটি ছোট বই বেরিয়েছে এবং ওই বইটি সমাদৃত হয়েছে,—এ জন্যই সাহস করে সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে লিখতে পেরেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী ও অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক বসুর 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং' বইটি-ই সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য বই। অধ্যাপক বসু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার আরও কয়েকটি দিক আছে যেগুলি আমার বইয়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা আমি করেছি।

এই কাজে আরও যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বন্ধুবর শ্রী অমল সেনগুপ্ত এবং অনুজপ্রতিম শ্রী সহদেব সাহা। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটির অসম্পূর্ণতা বা ভুল-ত্রুটি কারোর চোখে পড়লে এবং আমার নজরে তা আনলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

## পটভূমিকা

১

সুভাষচন্দ্র দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন ১৯২১ সালে। ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেম্ব্রিজ থেকে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার কাছে আমি আজ উপস্থিত হয়েছি —আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের তুচ্ছ এই শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবাযজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন।······আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

যে সেবাযজ্ঞের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সুভাষচন্দ্র I. C. S. Probationer-এর পদ ছেড়েছিলেন, তার সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই তার সতেরো বছরের মধ্যে। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের রূপরেখা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত কর্মসূচী এটাই প্রমাণ করে যে আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতিবিদ না হয়েও এই অমর দেশপ্রেমিক ও নেতা দেশের অর্থনীতি নিয়ে যা ভাবতেন আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদেও তার প্রাসঙ্গিকতা খুবই বেশী।

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমকালীন ভারতে দেশের অর্থনৈতিক চিন্তা প্রবাহ কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল সে সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা থাকা দরকার। ১৯২১ সালের পর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিতে দেশে গান্ধীযুগ পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গেছে। গান্ধীজী যেভাবে দেশের অর্থ-নীতিকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন তার মূল সূত্র ছিল—(১) স্বদেশী আন্দোলন, ঘরে ঘরে খাদি ও চরকার প্রবর্তন এবং গ্রামীণ কুটির শিল্পের

পুনরুজ্জীবন, (২) বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের প্রতি অনীহা, (৩) শিল্পক্ষেত্রে অছি নীতির ( Principle of Trusteeship ) প্রবর্তন, অর্থাৎ বড়-লোকদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সম্পদের যাতে কেন্দ্রীয়করণ (concentration of economic power) না হয় সেই ব্যবস্থা করা (৪) শোষণের অভাব, (৫) অপরিগ্রহ, ( Non-possession ), (৬) মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রতি অনীহা, (৭) অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা ও (৮) আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি উৎসাহের অভাব।[১]

১। অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। গান্ধীজী বড়লোকদের সমাজের অছি করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—"Q. You have asked rich men to be trustees. Is it implied that they should give up private ownership in their property and create out of it a trust valid in the eyes of the law and managed democratically ? How will the successor of the present incumbent be determined on his demise ?

In answer Gandhiji said that he adhered to the position taken by him years ago that everything belonged to God and was from God. Therefore it was for His people as a whole not for a particular individual. When an individual had more than his propertionate portion he became a trustee of that portion for God's people. God who was all-powerful had no need to store. He created from day to day and did not stock things. If this truth was imbibed by the people generally, it would become legalized and trusteeship would become a legalized institution. He wished it became a gift from India to the world.···As to the successor, the trustee in office would have the right to nominate his successor subject to legal sanction." Harijan, 23-2-1947.

শিল্পক্ষেত্রে মেসিন প্রবর্তন সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তিটিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : "There is no room for machines that would displace human labour and that would concentrate power in a few hands. Labour has its unique place in a cultured human family. Every machine that helps every individual has a place. But I must confess that I have never sat down to think out what that machine could be."—M. K. Gandhi, Harijan, July 28, 1946.

স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি, বৃহদায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নে অনাস্থা, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রভৃতি সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীজী অর্থনীতিকে নীতিশাস্ত্রের ( Ethics ) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক কল্যাণধর্মী অর্থশাস্ত্রে কিছু নৈতিক মূল্যবোধ স্বীকৃত হলেও সেই মূল্যবোধ গান্ধীজীর চিহ্নিত মূল্যবোধ থেকে আলাদা। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে সমর্থন করে বলেছিলেন, "দেশের মুক্তির জন্য যে শক্তি প্রয়োগের দরকার, সেই শক্তির প্রয়োগের ক্ষমতাই বর্জন আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত স্বরূপ। দেশের তরুণ দলেরই এই কাজে সর্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁরা দেশের সর্বত্র ঘুরে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বাণী প্রচার করুন। প্রত্যেক বছর বিদেশী বস্ত্র আমদানির জন্য ১২০ কোটি টাকা ভারত থেকে বিদেশে চলে যাচ্ছে। যদি বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন সফল হয় তাহলে ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। যারা এতদিন ভারতের অর্থ শোষণ করছিল তারাই সরকারকে ভারতের দাবি রক্ষা করার জন্য বাধ্য করবে।"[২] তিনি আরও বলেছিলেন, "আমরা নিরস্ত্র হলেও সমাজ শক্তি আমাদের হাতে আছে। ইংরেজের জীবিকা নির্ভর করে আমাদের হাতে। প্রতি বছর ১২০ কোটি টাকার বিলাতী দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানি হয় তার অর্ধেকই কাপড়। শাসনের নামে এই শোষণ চলছে। যদি আমরা এই শোষণের পথ রুদ্ধ করে দিই তবেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কামান-বন্দুকের চেয়েও বড়ো অস্ত্র অর্থনীতি।"[৩] স্বদেশী আন্দোলন বা বিদেশী দ্রব্য বর্জন, খাদির প্রচলন, গ্রামীণ শিল্পের পুনরুদ্ধার, কৃষকদের

অবস্থার উন্নয়ন, এসব ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতভেদ ছিলনা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক—দেশের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়াস, শ্রমিক আন্দোলনের সম্প্রসারণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে—সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি কী হবে অথবা স্বাধীনতালাভের পর দেশের অর্থনীতি কোন্ পথে এগোবে,—তা নিয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে সুভাষচন্দ্রকে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। লর্ড কেইন্‌স্ তাঁর প্রথম বইটি Indian Currency System-এর উপর লিখেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডে মুদ্রাসংকট দেখা যায় এবং তার প্রভাব দেখা যায় ভারতের উপর। ১৯২০-২১ সালে টাকা ও পাউণ্ডের হার প্রথমে ৩৩ পেনি (=২ শিলিং ৯ পেনি) ও পরে ২০ পেনিতে (=১ শিলিং ৮ পেনি) স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু, ইতিমধ্যে ষ্টার্লিং-এর দাম বেড়ে যাওয়ায় সে প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পাঁচ বছরে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে ব্রিটিশ মুদ্রার বিনিময় হার ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে। এই সমস্যাটি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে লেখা প্রথম চিঠিতেই (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১) সুভাষচন্দ্র লেখেন, "আমি যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite Policy নেই"।[৪] দেশবন্ধুর কাছে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে (২রা মার্চ, ১৯২১) তিনি প্রস্তাব দেন, "গত দশ বছরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হয়েছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হয়েছে এবং কোন্ কোন্ দিকে ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করতে হবে।" এই

৪। তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু। সম্পাদক, গোপাললাল সান্যাল, পৃষ্ঠা-৩

চিঠিতেই তিনি আরও লেখেন, "Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট Policy নেই। তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নেই। Vagrancy and Poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট Policy নেই। তারপর স্বরাজ পেলে আমাদের Constitution কি রকম হবে সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নেই।···স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈরি করতে হবে।"[৫] দেখা যাচ্ছে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সম্ভাব্য নীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেছিলেন।

## ২

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে অর্থশাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার মান অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সুভাষচন্দ্রের আমলে এই গবেষণার মান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। তারও আগে উনবিংশ শতাব্দীতে দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁদের গবেষণার দ্বারা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দাদাভাই নওরোজী এবং রমেশচন্দ্র দত্ত উভয়ই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭) ছিলেন ড্রেন থিয়োরী-র (Drain theory) প্রধান প্রবক্তা। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রধান বই ছিল "Poverty and UnBritish Rule in India". তাঁর মতবাদের তিনটি বিশেষ ধারা হল (১) ভারতীয়দের দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্য মোচন করার ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াসের অভাব, (২) সরকারের ব্যয় বাহুল্য এবং সেই সঙ্গে গরীব জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো এবং (৩) ভারত থেকে ব্রিটেনে একতরফাভাবে সম্পদ নির্গমন বা রপ্তানি যা "ড্রেন থিয়োরী"

---

৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৫-৬

নামে পরিচিত। ভারত থেকে বিদেশে "Home Charges" বাবদ যে টাকা চলে যেত সে সম্পর্কে নওরোজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতীয়দের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় হত তার একটি বড় অংশ খরচ করা হত ইংরেজ প্রশাসকদের বেতন ও পেন্সন দেওয়ার জন্য অথবা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বিলাত থেকে কিনে আনার জন্য। ইংরাজরা এদেশে যে টাকা খরচ করত তা ভারতীয়দের কাছ থেকেই আদায় করত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব ইংলণ্ডের রাজকোষে যেত। এগুলিকে বলা হত "Home Charges"—এর মাধ্যমেই ভারতের সম্পদ বিদেশে চলে যেত। দাদাভাই নওরোজীর একটি বিস্ময়কর গবেষণা ছিল ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে। তখনকার দিনে তথ্য সংগ্রহে অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও দাদাভাই নওরোজী-ই প্রথম ভারতের জাতীয় আয়ের সমীক্ষা করেন। ১৮৭০ সালে নওরোজীর হিসাব অনুযায়ী ১৫ কোটি জনসংখ্যার মোট জাতীয় আয় ছিল ৩০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২০ টাকা।

১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন যা থেকে সুভাচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। প্রবন্ধটির নাম, "ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পঞ্চাশ বৎসর : ১৮৭৫-১৯২৫" ;[৬] তের পৃষ্ঠা ব্যাপী এই প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র ভারতের বাণিজ্যে ব্রিটেনের শতকরা অংশের ক্রমহ্রাসমান ধারা (১৯১৫-১৬ সাল বাদে, কেননা যুদ্ধকালে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য সে বছর ভারতীয় কাঁচামালের রপ্তানি বেড়েছিল) এবং গ্রেট ব্রিটেনের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধটিকে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ হিসাবে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না,—এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের উপর দাদাভাই নওরোজীর প্রভাব সুস্পষ্ট। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে যে সব অর্থনীতিবিদের গবেষণামূলক আলোচনার উল্লেখ

৬। ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পঞ্চাশ বৎসর : ১৮৭৫-১৯২৫
সুভাষ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড ( জয়শ্রী প্রকাশন ) ২৮৭-২৯৯ পৃষ্ঠা।

করেছিলেন তা হল, ডক্টর বালকৃষ্ণের "Commercial Relations Between India and England," অধ্যাপক সি. জি. হ্যামিলটনের "Trade Relation between England and India" ডক্টর এস্. জি. পানানডিকারের "Economic Consequences of the War for India" এবং অধ্যাপক আর. এম. যোশীর "Indian Export Trade". বলা বাহুল্য বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে তাঁরা সবাই সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং তাঁদের লেখার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। এই প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য পরীক্ষা করলে দেখা যায় ১৯২১ সালে ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে যে প্রভেদমূলক শিল্প সংরক্ষণের নীতি ( Policy of Discriminating Protection ) চালু করেছিল ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সেই নীতির প্রতিক্রিয়া তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের উক্ত প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা অংশ হ্রাসের কারণ খুঁজতে বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই। প্রথম দিকে ওই দেশটির প্রাধান্যের কারণ ছিল সে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের দরুণ যে সব অদ্ভুত সুবিধা ভোগ করত সেইগুলি। রাজনৈতিক দিক থেকে সে ছিল এ-দেশে অপ্রতিহত প্রভাবের অধিকারী। আমাদের বাণিজ্যকে প্রায় পুরোপুরি ব্রিটিশ জাহাজের উপর নির্ভর করতে হত; অধিকাংশ রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী সংস্থা ছিল ব্রিটিশ; তেমনই ছিল বিনিময় ব্যাংকগুলি ও বীমা কোম্পানিগুলি। ভারতের রেলওয়ে বহুলাংশে ব্রিটিশ মূলধনের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থের পরিবর্ধক ব্রিটিশ জাহাজগুলির দ্বারা পরিচালিত হত।

"কৃষিবিষয়ক শিল্পগুলির ( তাদের কতকগুলির পেছনে ছিল ব্রিটিশ মূলধন ) অনেকগুলির ব্রিটিশ বাজারে ( যেমন চা, কফি ) সরবরাহের উদ্দেশ্যে আরম্ভ ও উন্নয়ন করা হয়েছিল। সরকারের কৃষিনীতিও ব্রিটেনের রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে পাট, তুলা, গম ও তৈলবীজের মতো কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের উৎসাহদানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে উৎপন্ন

পণ্যে ভারতের দাবি মেটানোর জন্য ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য শিল্পোন্নত দেশ। কয়েকটি উৎপন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে (যেমন তুলাজাত পণ্য) ভারত সরকারের শুল্ক-বিষয়ক আইন আমদানিকে সরাসরি উৎসাহিত করত। ভারতের যে সব উৎপাদনকারী শিল্প ওই দেশের সঙ্গে আমাদের আমদানি বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারত এই ধরনের আইন সেই-সব শিল্পের বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে সীমিত করত। সুতরাং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্য ছিল দুটি কারণের সম্মিলিত ফল: ওই দেশটির কাছে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পগত শ্রেষ্ঠত্ব।"

মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রানাডে বিশ্বাস করতেন, আপেক্ষিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করতে হবে। তাঁর মতে সরকারী তত্ত্বাবধান ও সাহায্যে দেশের মোট সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। রানাডে চেয়েছিলেন "রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে ব্যক্তি-প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।"[৭] তাঁর মতে সরকারী সাহায্যে (সরকারী মালিকানায় নয়) স্বল্পায়তন কৃষিক্ষেত্র বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে, কৃষির অনুপাতে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য বাড়তে পারে, গ্রামের লোক জীবিকার আশায় শহরে আসতে পারে এবং গ্রামকে যথাসম্ভব শহরে রূপান্তরিত (urbanisation) করা যেতে পারে। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের বিদেশে যাবার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে। রানাডে মনে করতেন, এভাবে দেশের সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হবে। তবে সম্পদ বেড়ে যাবার পর তার বণ্টন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে রানাডে বিশেষ কিছু বলেননি। ভারতে যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য রানাডে সরকার কর্তৃক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, গ্যারান্টি বা অর্থসাহায্য করে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিকদের চলাচলের সুবিধা করা, কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ

৭। অর্থনীতির পথে—ভবতোষ দত্ত, পৃষ্ঠা ৪৪

করেছিলেন। রানাডে যদিও জার্মাণ লেখক ফ্রেডরিক লিস্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি লিস্টের শিল্প সংরক্ষণ নীতির খুব একটা সমর্থক ছিলেননা। তবে ১৮৯৯ সালের মে ও জুন মাসে "Indian Economics" ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিদেশী চিনির উপর কর বসিয়ে দেশের চিনি শিল্পকে সাহায্য করার কথা রানাডে বলেছিলেন।[৮]

সুভাষচন্দ্রও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন, সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এবং গ্রামাঞ্চলকে শিল্পোন্নত অঞ্চলে ও শহরে রূপান্তরিত করার ( urbanisation ) প্রচেষ্টার উৎসাহী সমর্থক দিলেন। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের উপর রানাডে-র প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন আই. সি. এস্. অফিসার ; পরবর্তী কালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। যদিও রমেশচন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে কিছু বলেননি, তবুও তিনি দুটি ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং তখনকার দিনে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পক্ষে এই ধরনের সমালোচনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তাঁর প্রথম সমালোচনা ছিল, ভারতবর্ষের সরকারী ঋণের বোঝা অন্যায়ভাবে এই দেশের উপর চাপানো হয়েছিল এবং দ্বিতীয় সমালোচনা ছিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং ভারতে কর্মরত ইংরেজ শাসকগণ এদেশে নিজেদের ব্যবসায়ের দিকে এত বেশী নজর দিয়েছিলেন যে তার ফলে ভারতীয় শিল্পের দুর্দশা যে বেড়ে যাচ্ছিল এবং এদেশে শিল্পায়নের পথ রুদ্ধ হচ্ছিল সেদিকে তাঁরা তাকাননি। এক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজীর ড্রেন থিয়োরী এবং রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তর মধ্যে সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরাজশাসনের যে দুইটি সমালোচনা করেছিলেন অনুরূপ সমালোচনা সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। তবে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনায় যাঁরা ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁরা সবাই তাঁকে

---

৮। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭

অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা। স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা এবং সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে অফুরন্ত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুভাষচন্দ্র যখন বলেন যে দেশ থেকে যে কোন মূল্যে দাসত্ব ও দারিদ্র্য দূর করতে হবে তখন স্বামীজীর বাণীই তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্বামীজীর man-making mission, দেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান, দেশ থেকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার অভাব দূব করা, এগুলি সবই সুভাষচন্দ্র জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি, "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে আমি আত্মহারা হয়ে যাই, খুব কম লোকের পক্ষে—এমনকি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর জটিল ও ঋদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ তাঁর এই লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর বিশেষত বাঙ্গালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙ্গালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করেনা। ত্যাগে বে-হিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো—আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।"

"...পুরোহিত, উচ্চবর্গ, এবং বনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছেন—আপনারা তা পড়েছেন। যে সব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয়... আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিতাম।"[১]

১। মধ্যপ্রদেশের সিওনি সাবজেল থেকে 'মারহাট্টা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মিঃ এ আর ভাটকে লিখিত চিঠি (৬ মে, ১৯৩২)।

৩

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা জাতীয় নেতাদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে গান্ধীজীর সঙ্গে তার মত পার্থক্য এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি জওহরলাল নেহেরুর বিরূপ মনোভাব (ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর) দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জওহরলালের মধ্যে কিছুটা নৈকট্য ছিল,—গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দের চিন্তাধারার ছিল বিস্তর পার্থক্য। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর চিন্তার পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় যদিও সুভাষচন্দ্রই পণ্ডিত নেহরুকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন,[১০] কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার পার্থক্য ত্রিশের দশকেই বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় যদিও তাঁর সূচনা হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধানের পর এবং বিশেষ করে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে।

গান্ধী-সুভাষ বিরোধের চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের ভাষণের পর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে রূপরেখা সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে এঁকেছিলেন, গান্ধীজীর তা মনঃপূত হয়নি—এবং তার বিস্ফোরণ ঘটে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে। সুভাষচন্দ্র যখন বিপুল ভোটাধিক্যে ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করলেন, তখন গান্ধীজীকে বলতে হয়েছিল "Sitaramia's defeat is my defeat"

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণে আর একটি নাম গভীর ভাবে জড়িত, তিনি স্বর্গত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। জাতীয় পরিকল্পনা

কমিটি গঠনে সুভাষচন্দ্রের সর্বপ্রধান সাহায্যকারী ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সেই সঙ্গে আরও একজন ছিলেন—স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া যাঁর নাম আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া ছিল রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" থেকে লব্ধ প্রেরণা এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উৎসাহ। যদিও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বইয়ে পাচ্ছি তবুও সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি দিক হিসাবে এবং গান্ধীজীর উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের একটি পূর্বাভাস দেওয়া এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

সুভাষচন্দ্র কর্তৃক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হবার আগেই ত্রিশদশকের গোড়ায় আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা আরম্ভ হয়েছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদ (State Communism) এবং নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy)। রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদে কৃষকদের ফসল বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করার নীতি (compulsory procurement) জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। লেনিন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাড়াহুড়ো করে একটি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকাঠামোয় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার ঝুঁকি নেওয়া যে কঠিন তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তখন তিনি প্রবর্তন করলেন নয়াঅর্থনৈতিকনীতি (New Economic Policy)—এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে কিছু পরিমাণ খোলাবাজারের লেনদেন প্রবর্তিত হয়েছিল বলে তাকে বলা হত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State Capitalism), পরবর্তী পর্যায়ে রাশিয়ায় Collective Farming বা সমষ্টিগত চাষ ব্যবস্থা নিয়ে বিরাট বিতর্কের (The Great Debate) সৃষ্টি হয়। এই বিরাট বিতর্কে সমষ্টিগত আবাদ (Collective Farming) নিয়ে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই বিতর্কে দক্ষিণপন্থীদের নেতা (Right Wing) নেতা ছিলেন বুখারিন (Bukharin) এবং বামপন্থীদের নেতা ছিলেন প্রথমে ট্রটস্কি (Trotsky) এবং তার তাত্ত্বিক সমর্থক

প্রিয়ব্র্যাজেনস্কি (Preobrazhensky)। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে স্ট্যালিন পুরোপুরি ভাবে ক্ষমতায় আসার পর। রাশিয়ায় স্ট্যালিন ক্ষমতায় আসার পর পুরোপুরি ভাবে সেদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু হয়। বলা বাহুল্য বর্তমান বিশ্বে রাশিয়াই প্রথম দেশ যেখানে আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রথম প্রবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। সেদেশে পরিকল্পনার কর্মযজ্ঞ কবি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে 'রাশিয়ার চিঠি'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস।...এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল।...যাদের হাতে ধন যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য সবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।"[১১] রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় চাষীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। করি আরও লিখেছিলেন, "সেদিন মস্কো কৃষি আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখেনি ; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে, শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ। এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায়না। এরা সে কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।" [২] রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প এই তিনটির

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম খণ্ড। পৃষ্ঠা ৬৭৯

১২। ঐ পৃষ্ঠা ৬৯২,

উন্নতি ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। "এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ় আর-এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত।"[১৩] রবীন্দ্রনাথের মতে রাশিয়ার মূল সাফল্য ছিল সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্য, সৃষ্টি ও সর্বশ্রেণীর মানুষের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ার এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রশংসা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর কাছে রাশিয়ার এই রূপান্তর বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুরূপ ভারতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা যেতে পারে কিনা-সে বিষয়ে গান্ধীজী ছিলেন নীরব। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেছিলেন। ভারতে যে শিক্ষা বিস্তার, কৃষি সংস্কার এবং ব্যাপক শিল্পায়ন প্রয়োজন এবং এজন্য যে একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা দরকার সুভাষচন্দ্রের কাছে সেটা ছিল জরুরী প্রয়োজন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যে ব্যাপক শিল্পায়নের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার প্রশংসা শুধু কবির ভাবাবেগ নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতা। রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেও রবীন্দ্রনাথ সে দেশের রাজনৈতিক মতবাদ ও জীবনধারার অসম্পূর্ণতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর সুভাষচন্দ্র 'Independence League of India'-র বাংলা শাখার যে ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন তার উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় শিক্ষাবিস্তার, কৃষি-সংস্কার ও ব্যাপক শিল্পায়ন সম্পর্কে যে উদ্যোগ দেখেছিলেন,—সুভাষচন্দ্র কর্তৃক প্রণীত সেই ইস্তাহারে সেই উদ্যোগের চিহ্নই আমরা দেখতে পাই। এই ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র অসহযোগ

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৯৩

কর্মসূচীর সম্ভাবনা যে সীমাবদ্ধ তা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, "যদি ভারতের জনসাধারণের অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করতে হয়, যদি সামাজিকভাবে অত্যাচারিত ও অর্থনৈতিকভাবে পিষ্ট জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও জড়ত্ব থেকে জাগ্রত করতে হয় তবে একটি স্পষ্টতর বাণী ও আরো প্রত্যক্ষ আবেদন দরকার। তাদের কাছে এমন স্বাধীন ভারতের চিত্র তুলে ধরতে হবে যেখানে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে, সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থাকবে না।"[১৪] এই ইস্তাহারে যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

## অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

### মূলনীতি

অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা, সম্পত্তির সমবণ্টন, সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

### শিল্প সম্পর্কে

১. যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থায় লীগ বিশ্বাস করে। কিন্তু ঐসঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকেও উৎসাহ দেওয়া হবে।

২. মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা হবে।

৩. রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনের জাতীয়করণ করা হবে।

৪. শিল্পের পরিচালনা, কর্মচারী নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের বিষয়ে শ্রমিকদের মতামতের স্থান থাকবে।

৫. শিল্পে মুনাফার অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. শ্রমিক, মালিক ও পরিচালকের মধ্যে সকল বিবাদই নিরপেক্ষ সালিশী বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে। তার উদ্দেশ্য হবে ধর্মঘট ও লকআউট যেন অনাবশ্যক হয়ে যায়।

৭. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তির উপর করধার্য সহ কর আরোপ ও আইন প্রনয়ণের সাহায্যে ব্যক্তিগত পুঁজির সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।

৮. সমবায়ের মাধ্যমে ও অন্যভাবে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে ও সুদের উচ্চতম হার বেঁধে দিয়ে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৯. কারখানার শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টার কর্মদিবস করা হবে।

১০. রাষ্ট্র বেকার ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা দেবে।

১১. শ্রমিকদের সুবিধার জন্য এসব ব্যবস্থা করা হবে; (ক) অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার জন্য বীমা, (খ) প্রসূতি কল্যাণ ব্যবস্থা, (গ) শিশুদের জন্য ক্রিশে, (ঘ) শ্রমিকদের বাসগৃহ, (ঙ) পর্যাপ্ত ছুটি ইত্যাদি।

## কৃষি সম্পর্কে

১. একই রকম ভূমি প্রথা।

২. রাষ্ট্র সমহারে করের ব্যবস্থা করবে।

৩. রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বাতিল করা হবে।

৪. ক্ষতিপূরণের সাহায্যে জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হবে। তাছাড়া এই ইস্তাহারের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীও ছিল। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী ১৯২৮ সালে তৈরি হয়েছিল তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং সর্বপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থার জাতীয়করণ, ব্যাপক শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা, শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সবই ছিল কল্যাণধর্মী পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্বাভাস। সুভাষচন্দ্রের দূরদৃষ্টি ছিল এখানেই। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম তাঁকে এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছিল। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা, সম্পত্তির সম-বণ্টন করা, সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা স্বাধীনভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে গান্ধীজীর কল্পিত অছি ব্যবস্থা ( Trusteeship System ) অবাস্তব বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক গভীরভাবে

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন তিনি হলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। সুভাষচন্দ্র যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং এক্ষেত্রে তাঁরও যথেষ্ট অবদান ছিল। যেহেতু সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয় পরিকল্পনার প্রবর্তক সেজন্য তিনি যাতে কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারেন সেজন্য মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন আদায়ের জন্য ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে মেঘনাদ সাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একটি ছাত্র সভায় বলেছিলেন যে জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য শহর থেকে গ্রামে ফিরে গিয়ে কুটিরশিল্পের উন্নতি করা ও চরকা ঘোরায় লাভ হবে না। ১৯৩৮ সালের ১৪ই নভেম্বর সেই ছাত্রসভায় মেঘনাদ সাহা কয়েকটি বেপরোয়া উক্তি করেছিলেন সন্দেহ নেই যার ফলে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমরা ডক্টর সাহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি "I have no glamour for villages and do not think they are ideal places for living ··Ruralisation will only lead to continuous exploitation of the poor by a few capitalists."[১৫] মেঘনাদ সাহা যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল, গ্রামীণ জীবনের পূর্ণ রূপান্তর করতে হবে,—কারণ দেশ চিরকালই কৃষি-নির্ভর থাকবে তা হয় না। এই ব্যবস্থার বিকল্প হল দেশের দ্রুত শিল্পায়ন যার দ্বারা বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে। এজন্য দরকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। মেঘনাদ সাহা তাঁর বক্তৃতায় 'জড়বাদী' বলে অনেকের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলেন; অবশ্য সে আলোচনা আমাদের বিষয়বস্তু নয়।[১৬] কৃষির উন্নতি ও আধুনিকীকরণ মেঘনাদ সাহা চেয়েছিলেন; কিন্তু গান্ধীজীর

১৫। শঙ্করী প্রসাদ বসুর "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-২৭

১৬। পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে শ্রীঅনিলবরণ রায় ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের উপর আঘাত ছিল বলে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন। শঙ্করী প্রসাদ বসু—"সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" পৃষ্ঠা ২৭

গ্রামীণ শিল্পনীতি যে দেশের উন্নতি ঘটাতে পারবেনা,—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক প্রবক্তা। এজন্য গান্ধীবাদী কুমারাপ্পা মেঘনাদ সাহার কঠোর সমালোচনা করেন। ডক্টর সাহার মতে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে এবং দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন ছিল ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন। মেঘনাদ সাহা "Science and Culture" পত্রিকায় ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।[১৭] তাছাড়া ১৯৩৮ সালে Modern Review পত্রিকায়ও তাঁর একটি প্রবন্ধ বেরোয় যার নাম ছিল "Philosophy of Industrialisation" :—এই প্রবন্ধগুলিতে মেঘনাদ সাহা ধারাবাহিকভাবে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক নীতির তীব্র সমালোচনা করে গেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন দরকার। চীনে সান ইয়াত সেন ( Sun Yat Sen ) শিল্পোন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রবর্তন করার পক্ষেও তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। "Indian National Reconstruction and the Soviet Example" (1937. oct ) প্রবন্ধে মেঘনাদ সাহা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে ভারতের ক্ষেত্রে সোভিয়েত পরিকল্পনাই অবলম্বনীয়। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়া এবং ত্রিশ

১৭। (i Irrigation Research in India, December, 1936,
(ii) Industries and Scientific Research, March, 1937.
(iii) Problems of Industrial Development in India, May, 1937, (iv) On the National Supply of Electricity, August, 1937, (v) Indian National Reconstruction and Soviet Example, October 1937, (vi) Need for Power Research and Investigation Board in India, February, 1938, (vii) The Intelligent Man's Guide to the Production and Economics of Electrical Power, May, 1938, (viii) Symposium on India's Power Supply, May 1938, (ix) The Next Twenty-five years of Science in Ind a, July, 1938. (x) Congress President on National Reconstruction, September, 1938, (xi) Technical Assistance to Indian Industry by the Govt. of India, September, 1938, and (xii) Industrial India, January, 1939.

দশকের ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে রাশিয়া যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে পারে তবে ভারতবর্ষই বা পারবে না কেন? তাঁর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা নানা দিক দিয়ে ভারতের অনুরূপ ছিল। কৃষকরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৪ শতাংশ, দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লেগেই ছিল এবং শিল্পব্যবস্থাও ছিল একেবারে অনুন্নত। অথচ ক্ষমতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া কৃষি, শিল্প, পরিবহন, জলসম্পদ, সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছিল। কৃষি, খনিজ শিল্প, নদী-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ উৎপাদন-এ সর্বক্ষেত্রে রাশিয়ার দ্রুত উন্নতিতে মেঘনাদ সাহা বুঝতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই যুক্তি তো গ্রহণযোগ্য হয়ইনি। বরং গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে মেঘনাদ সাহাকে বিস্তর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া যে পদ্ধতিতে দ্রুত উন্নতির পথে এগোচ্ছিল সুভাষচন্দ্র তার সারবত্তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং ভারতের জন্যও যে জাতীয় পরিকল্পনা করা দরকার এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুভাষচন্দ্র জানতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল ধনতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল। অপরদিকে রাশিয়ায় যে রাজনৈতিক বিপ্লব হয়েছিল তার পরিণতিতে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিক হল উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সামাজিক মালিকানা। শিল্প জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সমাজ-তান্ত্রিক দেশে উন্নয়নের উত্তরণ হয়। সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন,—রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না তা তিনি জানতেন। রাশিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।[১৮] সুভাষচন্দ্র

১৮। "People in India have not been interested so much in the Communist movement as in the work of reconstruction in Soviet

রাশিয়ার দ্রুত শিল্পায়নে মুগ্ধ হয়েছিলেন, যেভাবে রাশিয়া সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান করেছিল তারও তিনি প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু তিনি অন্ধভাবে রাশিয়ার অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমরা যদি দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়াস বেসরকারী উদ্যোগের কাছে ছেড়ে দিই তাহলে সম্ভবতঃ সমস্যার সমাধানে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। সেজন্য ভারতের জনমত একটি সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার পক্ষপাতী যাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে উন্নয়নের উদ্যোগ ছেড়ে দেওয়া হবে না। অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধানে রাষ্ট্রকেই সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নই হোক, আর কৃষির আধুনিকীকরণের প্রশ্নই হোক, রাষ্ট্রকেই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং দায়িত্বগ্রহণ করতে হবে এবং স্বল্পকালের মধ্যে সংস্কার কার্যকর করতে হবে যাতে খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয় জনসাধারণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

Russia—in the rapid industrialization of that country and also in the way in wh ch the Soviet Government solved the problem of minorities. It is this constructive achievement of the Soviet Government which was studied with great interest by people in our country. As a matter of fact intellectuals like our poet Tagore, who had no interest in communism as such, were profoundly impressed when they visited Russia in the work of educational reconstruction in that country."

"...Let us examine the Soviet experiment based on communism. you will find one great achievement and that is planned economy. Where communism is deficient is that it does not appreciate the value of national sentiment. What we in India would like to have is a progressive system which will fulfil the social needs of the whole people and will be based on national sentiment. In other words, it will be a synthesis of Nationalism and Socialism." Excerpts from the Speech delivered by Netaji in Novermber 1944 to the Students of the Tokyo Imperial University. Reprinted in the Indian Struggle, 1935-1942 in an appendix. ( Chuckerverty, Chatterjee & Co, Calcutta, 1952 )

কিন্তু এই সমস্যাগুলির সমাধানে ভারত তার নিজস্ব পথে চলবে। সুতরাং আমরা এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করব যা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী হয়।”[১৯]

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে, ১৯২২ সালে নিখিলবঙ্গ যুবক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় পুনর্গঠন। ডক্টর সাহা তাঁর ভাষণে বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা এবং দেশের দারিদ্র্য মোচনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকার কথা বলেছিলেন।[২০] সুভাষচন্দ্রের তখন ভাব-প্রবনতা বেশী। তাঁর তখন একমাত্র স্বপ্ন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ও ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুব সমাজকে সংগঠন করা এবং অসহযোগ আন্দোলনকে

১৯। ‘If we leave it to private initiative to solve the problem of poverty and unemployment for instance, it will probaly take centuries. Therefore, public opinion in India is in favour of some sort of a socialist system, in which the initiative will not be left to private individuals, but the state will take over the responsibility for solving economic questions. Whether it is a question of industrializing the country or modernizing agriculture we want the state to step in and take over the responsibility and put through reforms within a short period, so that the Indian people could be put on their legs at a very early date. But in solving this problem, we want to work in our own way···Therefore, system that we shall ultimately set up will be an Indian system to suit the Indian people” Excerpt from Netaji's Speech at the Tokyo Imperial University, Nov. 1944 Ibid.

২০। ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের পেছনে এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন সবার সামনে তুলে ধরার পেছনে ডক্টর মেঘনাদ সাহার অবদান প্রচুর। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর “সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং” বইটিতে। পুনরুক্তি হবে বলে ডক্টর মেঘনাদ সাহার ভূমিকা সম্পর্কে এক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

সুসংগঠিত করা। জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা তখনও পরিণত রূপ নেয়নি। ১৯২৮ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের বাংলা শাখার ইস্তাহারে আমরা সুভাষচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারার একটি পরিণত রূপ পাই।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস যদি নিরপেক্ষভাবে কোনদিন লিখিত হয় তবে আরেকজনের নাম সবাই সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করবেন তিনি হলেন স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। স্যার বিশ্বেশ্বরায়া ১৯২৩ সালে ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ( Indian Science Congress ) এবং ১৯২৪ সালে ছিলেন ভারতীয় অর্থ নৈতিক সম্মেলনের ( Indian Economic Conference ) সভাপতি। তিনি নিজে ছিলেন বড় যন্ত্রবিজ্ঞানী। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রচারকাজও করেছেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হ'ল "Reconstructing India" এবং "Planned Economy for India"। ১৯৪০ সালের ২৫শে জুন ( তখন স্যার বিশ্বেশ্বরায়া চাকুরী-জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন ) বোম্বাইয়ের Royal Institute of Science-এ যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন,[২১] "আধুনিক পৃথিবীর অগ্রগতি ও সভ্যতার বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানের দ্বারাই হয়েছে যার উপরে এখানকার শিল্প ও বাণিজ্য নির্ভরশীল।...

"জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিল্পের প্রয়োজন সর্বাধিক, আর শিল্পের বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পের উন্নতির জন্য ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণা খুবই প্রয়োজনীয়। এই ধারণাটি আমাদের দেশে যথাযোগ্যভাবে বুঝে ওঠা হয়নি। "বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণা শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার পথ পরিষ্কার করে, সুতরাং সে বিষয়ে অবহেলা অনুচিত। কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, শিল্পবিষয়ক গবেষণার সম্প্রসারণ।...

"বৃহৎ শিল্পের উন্নতির দ্বারা বাস্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমরসম্ভার এবং অন্যান্য যান্ত্রিক শক্তিতে জাতি বলীয়ান

হয়। শিল্পের উন্নতিতে জনগণ কেবল বৃহৎ আকারে উৎপাদনের সামর্থ্যই লাভ করবে না, সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত সামর্থ্যও অর্জন করবে।"[২১]

স্যার বিশ্বেশ্বরায়া ছাড়াও ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তখন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরও দেশের দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে Modern Review পত্রিকা শিল্প ও অর্থনীতি সম্পর্কে যে সংখ্যা বের করে তাতে তাঁদের লেখা ছিল। তাছাড়া, জি এল মেহতা, ডি. পি. খৈতান, এ আর দালাল, এবং অধ্যাপক ভি সুব্রহ্মণ্যও এই সংখ্যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ভারতে শিল্পোন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখেন। Modern Review ১৯৩৮ সালের নভেম্বর সংখ্যায় "The Industrializatin of India" নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের করে। এই কথাগুলি এখানে উল্লেখ করার কারণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই এবং বিশেষ করে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ চন্দ্রের সভাপতি পদে নির্বাচিত হবার আগে থেকেই ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা চলছিল। অথচ এক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহেরু খানিকটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী দেখালেও গান্ধীজী ছিলেন নীরব। যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় তখন সুভাষচন্দ্রই পণ্ডিত নেহরুকে আমন্ত্রণ জানান সেই কমিটির সভাপতি হবার জন্য—জওহরলাল সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে যাতে পরিকল্পনা কমিটি

২১। ডক্টর মেঘনাথ সাহার উদ্ধৃতি,—শঙ্করী প্রসাদ বসু কর্তৃক সংকলিত।
"সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" পৃষ্ঠা ৮৩.৮৪

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সাহা Science and Culture পত্রিকায় ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় যা লিখেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে, "Sir M, Viveswaraya has published a number of reports, on engineering designs and works and on technical and technological education, economic developement and kindred topics and addresses touching the well—being of the masses and their moral and material advancement."

গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্যই জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করা হয় যদিও এই কমিটির প্রস্তুতিপর্বে তাঁর কোন অবদান ছিলনা; কারণ, যখন তাঁকে সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তিনি ছিলেন বিদেশে। যে পরিকল্পনা তখন তৈরি করা হয় তার খসড়া প্রস্তুত করেন পি এন ঘোষ এবং মেঘনাদ সাহা। গান্ধী অনুগামীরা এই পরিকল্পনা কমিটি গঠনের ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেননি, এবং এটা যে তাঁদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য হবেনা সুভাষচন্দ্র সে বিষয় অবহিত ছিলেন। তবে জওহরলাল নেহরু সভাপতির পদ গ্রহণ করে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আমি ভারতের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি, কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কোনো যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই কমিটি সম্বন্ধে যখন দিল্লী প্রস্তাব-গুলি পেয়েছিলাম, তার ব্যাপকতায় যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, তাহলেও তাদের বিস্তৃত ও দূর প্রসারী রূপ দেখে আমি খুবই আনন্দিত।" এখানে প্রশ্ন হল, দীর্ঘদিন ধরেই যদি নেহরুজী ভারতের জন্য জাতীয় পরি-কল্পনার কথা ভেবে থাকেন তবে দেশের দ্বিতীয় প্রধান নেতা হিসাবে (গান্ধীজীর পর) ত্রিশের দশকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি কয়টি ভাষণ দিয়েছিলেন এবং কি কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করার পেছনে জওহরলালের ভূমিকা নিষ্প্রভ। একমাত্র ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্বে শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে একটি আন্তঃ প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠনের পুরো দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র নিজের হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধ গান্ধী ভক্ত এবং নেহরু ভক্তগণ এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে বড় করে দেখতে চাননা। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠনের প্রস্তাবের গোড়ার কথা হল, ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাব যাতে (১) জাতীয় পুনর্গঠন ও সামাজিক পরিকল্পনা গঠনের জন্য আশু ও মূলগত উভয় শ্রেণীর সমস্যা বিবেচিত হয়; (২) বন্যা নিবারণ, সেচের জল সরবরাহ

ভূমিক্ষয় নিরোধ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, প্রতি সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হয়, (৩) বিভিন্ন নদী উপত্যকা নিয়ে সন্ধান ও গবেষণা চালানো হয়, এবং (৪) শিল্পসমূহের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আন্তঃ প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল জওহরলালের সভাপতিত্বে। কিন্তু জওহরলাল এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেননি; এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করার কৃতিত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের, যিনি পরের বছর (১৯৩৮) কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সভাপতি হবার পরেই সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দ্রুত এগোলেন।

মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী ভি. ভি. গিরি (পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সভাপতিকে শিল্পমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করার ক্ষমতা দেয়। তার ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ২রা অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্প-মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে "দারিদ্র্য ও বেকারী, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শিল্পায়ন ভিন্ন কখনই করা যাবে না। শিল্পায়নের পথে অন্যতম পদক্ষেপ রূপে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত।" এই সম্মেলনই পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করেছিল। (Planning Committee) তাছাড়া এই সম্মেলনে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য নিয়ে পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সর্বভারতীয় কমিশন গঠিত হওয়া উচিত, যার নাম হবে The All India National Planning Commission. এই কমিশন গঠনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ভি. ভি. গিরিকে। সুভাষচন্দ্রের তাগিদেই জওহরলাল পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হতে স্বীকৃত হন। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি National Planning Committee গঠনে জওহর-লালের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে জওহরলালের সক্রিয় ভূমিকার অভাব কি শুধু গান্ধীবাদীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য? দেশ স্বাধীন হবার পর

গান্ধীজীর তিরোধানের পর জওহরলাল নেহরু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এবং উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে এই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রতি আশানুরূপ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেননি।

এই প্রসঙ্গে জওহরলালের ভূমিকা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যায়। জাতীয় পরিকল্পনার ধারণাটি সম্পর্কে গান্ধীজী যে বিরক্ত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগষ্ট জওহরলালকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। গান্ধীজী সেই চিঠিতে জওহরলালকে জানিয়েছিলেন যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কার্যকলাপের উপযোগিতা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। চিঠির ভাষায়, "আমার মনে হচ্ছে প্রভূত অর্থ এবং প্রচুর সময় এমন একটি কাজে ব্যয়িত হচ্ছে যার ফল একেবারেই কিছু হবে না; কিংবা সামান্য কিছু হবে—এই হল আমার সন্দেহ।"[২২] জওহরলাল জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেও তার অন্যতম উদ্যোক্তা মেঘনাদ সাহার কথাবার্তা মোটেই পছন্দ করেননি এবং কৃষ্ণ কৃপালনীকে সে কথা জানিয়েছিলেন। জওহরলাল ১৯৩৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে কৃষ্ণ কৃপালনীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে, তবে ভারতের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্পের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ দিলেও কুটির শিল্পের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না গান্ধীজী আবার ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'হরিজন" পত্রিকায় লিখেছিলেন, কংগ্রেসের লক্ষ্য শিল্পায়ন নয়—কুটিরশিল্পের বিস্তার।

সুভাষচন্দ্রের জন্যই জওহরলাল জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হতে পেরেছিলেন। ইচ্ছা করলে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রই

২২। চিঠিটির অনুবাদ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং," পৃষ্ঠা ১৩৪

নিজেকে এই পদে রাখতে পারতেন। তাছাড়া এই কমিটি গঠনের পেছনে পুরো উদ্যোগ সুভাষচন্দ্রের। কিন্তু জওহরলাল তাঁর "Discovery of India" বইয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা বা অবদানের কথা উল্লেখ করেননি। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান সহ-সভাপতি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে উপেক্ষা করে আমাদের দেশের পরিকল্পনার ধারাকে জওহরলালের একটি "বহুমূল্য দান" ( precious gift ) হিসাবে অভিহিত করেছেন।[২৩] এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে এবং তা প্রকাশ করার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এজন্য কি ইতিহাস পাল্টাবে? ডক্টর মনমোহন সিং যদি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতালাভের পর ভারতের পরিকল্পনা-ধারায় জওহরলালের অবদানের কথা বলতেন, তবে এই বক্তব্য হয়ত তিনি রাখতে পারতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পরিকল্পনার ধারা প্রবর্তনে জওহরলালের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু যেহেতু দেশ স্বাধীন হবার পর জওহরলাল পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন এজন্য তাঁর ভক্তরা তাকেই আমাদের দেশে পরিকল্পনার প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতারিত হবার পর জওহরলাল জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর হন। পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি পদ থেকে হরিবিষ্ণু কামাথকেও তখন সরিয়ে দেওয়া হয় কারণ তিনি ছিলেন সুভাষ ভক্ত। সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতায় প্রগতিশীল জওহরলাল রক্ষণশীল প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহযোগী হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এই অধ্যায় খুবই বেদনাদায়ক।

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রস্থলহচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এজন্যই আমাদের দেশে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের পূর্বাভাস খানিকটা আলোচিত হল। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ

২৩। Foreword of Dr Monmohan Singh to the Seventh Five Year Plan; "The planning process is the precious gift of Pandit Jawaharlal Nehru to the people of India. Indiraji nursed this tender plant with great and loving care."

আমরা এভাবে করতে পারি—(১) দেশের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুভাষ-চন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা, (২) দেশের শিল্পায়ন ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কর্মসূচী প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র, (৩) শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং (৪) সুভাচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে অর্থ নৈতিক চিন্তার সমন্বয়।

সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের কাজের প্রথম পর্বে আমরা দেখতে পাই বিলাতী দ্রব্যের বর্জন ও বয়কট আন্দোলনের নেতা সুভাষচন্দ্রকে। খাদির পক্ষে তিনি প্রচার চালিয়েছেন—দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর মহাত্মা গান্ধীকেই তিনি নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৯২৮ সালের পর। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল—এই এগারো বছরে সুভাষ-চন্দ্রের জীবনে ও চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা হলেই সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

---

## কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা

সুভাষচন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়নে সুভাষচন্দ্র বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং দেশের দ্রুত শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঠিকই—কিন্তু এজন্য তিনি দেশের কৃষিউন্নয়ন সমস্যা এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নকে খাটো করে দেখেননি। বরং এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীও তৈরি করেছিলেন। দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ যে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রের চরম অনগ্রসরতা, সুভাষচন্দ্র সেবিষয়ে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয় সেই প্রশ্ন সুভাষচন্দ্র তুলেছিলেন, "পৃথিবীতে তো আরো দেশ রয়েছে—সেখানে দুর্ভিক্ষ হয়না কেন?[1] আমাদের এই সোনার বাংলায় যেখানে অপর্যাপ্ত শস্য হয় সেখানে প্রতি বছরই দুর্ভিক্ষের এই তাণ্ডব নৃত্য কেন? এই তো সেদিন উত্তরবঙ্গে ভীষণ প্লাবন হয়ে গেল।···কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নই প্রথমে মনে জাগে যে, বন্যা হয় কেন? উত্তর হবে—অতিবৃষ্টির জন্য বন্যা হয়—তার প্রতিরোধ করা মানুষের অসাধ্য। দুর্ভিক্ষ হয় কেন? বৃষ্টির অভাবেই দুর্ভিক্ষ হয়—তার প্রতিকার করার ক্ষমতাও মানুষের নেই। কিন্তু এই উত্তরেই কি সন্তুষ্ট থাকা যায়? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যে-সব দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হলে মানুষের ক্ষমতায় তা অবিলম্বে নিবারিত হয় এবং বর্ষে বর্ষে আমাদের দেশের মতো সে সব দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হয় না। এক বাংলায় যে শস্য হয় তা সমগ্র ভারতবর্ষ দুই বছর খেয়ে ফুরোতে পারে না—তথাপি আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন? সুভাষচন্দ্র দেশে দুর্ভিক্ষের পেছনে পরাধীন দেশের উপায়হীনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

১। বালুরঘাট পাবলিক আঞ্জুমান ইসলামিয়া, মহিলা সমিতি ও রেণু সংঘের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনার উত্তরে ভাষণ, কৃষি-উন্নয়ন, সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ২৬শে মে. ১৯২৮

অতিবৃষ্টির সময় বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং অনাবৃষ্টির সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তা করেননি। সুভাষচন্দ্র সমগ্রদেশে খাদ্যশস্য চলাচলের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করেছিলেন। "আমাদের দেশে যখন প্রচুর শস্য হয় তখন কোনোস্থানে দুর্ভিক্ষ হলে সেখানে অনায়াসেই শস্য পাঠানো যায়, কিন্তু কার্যত তা কখনো হয় না। ইংলণ্ডে যে শস্য জন্মে তাতে দুই/তিন মাসের বেশি সে দেশের লোকের চলে না। সুতরাং অন্যদেশ থেকে শস্য আমদানি করতে হয় এবং সে অন্যদেশ প্রধানতই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও এই দেশ থেকেই ইংরেজদের অভাব পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত শস্য রপ্তানি করা হয়। যতদিন না রপ্তানি বন্ধ হয় ততদিন ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ কিছুতেই নিবারিত হবে না। কিন্তু এটা বোঝা সত্ত্বেও আমাদের এমন অবস্থা যে, আমরা কোনোরূপেই রপ্তানি বন্ধ করতে পারি না।"[২] দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য স্থান থেকে খাদ্য আমদানি করা এবং দেশ থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করার পক্ষে সুভাষচন্দ্র যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশের অনুন্নত কৃষিব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার কোন পন্থা কি সুভাষচন্দ্র নির্দেশ করেননি? এই প্রসঙ্গে হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯১৮) সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ প্রণিধানযোগ্য: পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাবে তাই হবে আমাদের প্রধান সমস্যা। তার জন্য প্রয়োজন হবে জমিদারী প্রথার অবসান সহ আমাদের ভূমি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার। কৃষি-ঋণের অবসান ঘটাতে হবে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য সহজ-ঋণের সংস্থান করতে হবে। উৎপাদক ও ব্যবহারিক উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হবে। জমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।"[৩] এই উক্তিটির

---

২। ঐ

৩। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ, সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষ রচনাবলী (জয়শ্রী প্রকাশন) ৪র্থ খণ্ড।

বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথমেই সুভাষচন্দ্র দেশের দারিদ্র্যের ভয়াবহতার ইঙ্গিত করেছেন। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালেও সুভাষ-চন্দ্র দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং এজন্যই পরিকল্পিত অর্থনীতিই যে দেশের পক্ষে কাম্য তার উপর জোর দিয়েছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র সমগ্র কৃষিব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের জন্য সর্বাত্মক এক পরিকল্পনা, রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং সেই সঙ্গে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করার যে প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিব্যবস্থার সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে রয়ে গেছে এক নিবিড় সম্পর্ক। ভূমিসংস্কারের ফলে জমির মালিকানার পরিবর্তন হয়। যাঁরা পূর্বে জমির মালিক ছিলেন না, তাঁরা যখন জমির নূতন মালিক হন, তখনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের উৎপাদন বাড়াবার আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা বেড়ে যায়; তার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু জমির উপর কৃষকদের মালিকানা বা উৎপাদন বাড়াবার উৎসাহ-ই যথেষ্ট নয়; সেই সঙ্গে থাকতে হবে উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ, উপযুক্ত পরিমাণ সারের যোগান ও জলসেচের ব্যবস্থা। এক কথায় ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষিপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুভাষচন্দ্র এ-জিনিসটির উপর জোর দিয়েই কৃষি ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ এবং কৃষিপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভূমিব্যবস্থার সংস্কার এবং সেই সঙ্গে কৃষি ঋণের অবসান ঘটিয়ে কৃষকদের জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা করলে তার একটি বিনিয়োগ প্রভাব ( Investment Effect ) এবং একটি উৎপাদন প্রভাব ( Production Effect ) পরিলক্ষিত হতে পারে। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সুভাবচন্দ্র চেয়েছিলেন জমিদারী প্রথার বিলোপ। লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল তখন থেকেই আমাদের দেশে জমিদার গোষ্ঠী দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকরাও জমিদারদের দয়ার উপর-ই নির্ভর

করত। জমিদারী প্রথার বিলোপ না করলে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব নয়। ভারতে যতদিন জমিদারী প্রথা চালু ছিল ততদিন কৃষকরা শুধু জমিতে চাষ-ই করত ; জমির উপর তাদের মালিকানা না থাকায় উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে তাদের কোন আগ্রহ থাকতনা। তাছাড়া কৃষির উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার জমিদাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করেনি। বহুক্ষেত্রে জমিদাররা কৃষকদের শোষণ করেছে। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের কৃষি-ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ছিল জমিদার ও মহাজনদের শোষণ, সরকারী ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা, কৃষক-দের উপর ঋণের বোঝা এবং কৃষি-উৎপাদনের স্বল্পতা। এই অনুভূতি থেকেই সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে কৃষি-ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার এবং ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলেছিলেন। অবশ্য কৃষিউন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary condition) হলেও এটা যথেষ্ট বা সম্পূর্ণ শর্ত (sufficient condition) নয়। কৃষির উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ, উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ, ভাল বীজ রোপণ, উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা—এগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষচন্দ্র এজন্যই ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থনীতির আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন, "উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ করতে হবে।"—এই উক্তিটির তাৎপর্য খুবই গভীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দেশে সমবায় আন্দোলনের অবস্থা ছিল করুণ। শুধু উৎপাদন ক্ষেত্রেই নয়—উৎপাদিত জিনিস বাজারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রেও চাষীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে জমির যারা নূতন মালিক হচ্ছে তারা যাতে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করে, তার উপর সুভাষচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া কৃষকদের আথিক দুরবস্থা দূর করার জন্য যাতে সহজ শর্তে তাদের ঋণ দেওয়া যায় এজন্য—সুভাষচন্দ্র সমবায়-ব্যাংক স্থাপনের উপরও বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কৃষিজাত সামগ্রী বাজারে বিক্রি করার ক্ষেত্রে কৃষকদের যে সমস্যার

সম্মুখীন হতে হয় বিশেষ করে পাটচাষীদের যে সব সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় সুভাষচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং তার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনবোধে পাটের চাষ কমাবার পক্ষেও যুক্তি দেখিয়েছিলেন। পাট-চাষ একমাত্র বাংলায়ই হয়। কিন্তু বাংলার পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য পায়না। বিশ্বে বছরে পাটের চাহিদা পাঁচ কোটি মণ। যখনই উৎপাদন তার তুলনায় বেড়ে যায় তখন পাটের মূল্য কমের দিকে যায়। গত বছর (১৯২৭) অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে। তাই পাটের দাম কমে গেছে। এত কমেছে যে উৎপাদনের খরচও পোষায়নি। দেশে প্রচুর পরিমাণ পাট মজুত আছে। এ বছর যদি পাট চাষের জমি না কমানো যায় তবে পাটের দাম আরো পড়ে যাবে।...

"যে কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাট উৎপাদন করে তারা তাদের কঠোর শ্রমের মূল্য পায় না, অথচ বিদেশী চটকল মালিকরা—যাঁরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁরা অপিরেময় মুনাফা লুট করছে—এটাই ভাগ্যের পরিহাস।

"পাট চাষ কমানো সম্পর্কে চাষীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে প্রচার কার্য চালাচ্ছে তার ফলে, অজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী কৃষকসমাজকে যারা শোষণ করে তারা ঘাবড়ে গেছে বলে শুনছি। পাটের দর সাময়িকভাবে বাড়াবার কথা চলছে। পাট উৎপাদকরা পাট চাষের জমি যাতে বাড়ায় সেজন্য প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যই তার মূলে। এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।"[৪]

এক্ষেত্রে একটি জিনিষ লক্ষণীয়। চটজাত সামগ্রী রপ্তানি করে ইংরেজ চটকল মালিকরা আমাদের দেশ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল। অথচ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য পেতনা। স্বাধীনতার আগেই ফিনলো কমিটি। (Finlow Committee) এবং ফকাস কমিটি (Fawcus Committee) পাটের বাজার-ব্যবস্থার এরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন,

---

৪। রাজশাহী শহরে সমাজ সেবক সংঘের নূতন ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ এপ্রিল, ১৯২৮,

গ্রামে পাটের উৎপাদকরা প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদিত কাঁচা পাট ফড়েদের কাছে বিক্রি করে। উৎপাদকদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রামের হাটে অথবা প্রাথমিক বাজারে (Primary Markets) পাট বিক্রি করে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির (Indian Central Jute Committee) বাজার বিষয়ক অনুসন্ধানে (১৯৪০) দেখা যায়, উৎপাদকরা মাথাপিছু গড়ে কদাচিৎ ২০ মণের বেশী পাট বিক্রয় করত। ফড়ে এবং ব্যাপারী যারা ছিল তারা হাট বা প্রাথমিক বাজারে কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনে এনে সেটি বড় বড় ব্যবসায়ী বা আড়তদারের কাছে বিক্রয় করত,—এই লেনদেন হত মাধ্যমিক বাজারে ( Secondary Market)। আড়তদাররা অবার সেই পাট বস্তা-নির্মাণকারীদের কাছে বিক্রি করত।[৫] এই ব্যবস্থায় পাটচাষীরা কিছু পেতনা। সুভাষচন্দ্র এই সমস্যাটির গভীরে ঢুকতে পেরেছিলেন এবং এটাও বুঝেছিলেন যে এই সমস্যার সমাধানে তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য পাবার আশা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর যখন জওহরলাল নেহরুর সরকার Jute Enquiry Committee (1954) গঠন করেন-তখন সেই কমিশন তাঁর প্রতিবেদনে চিরাচরিত ঋণের বিরুদ্ধে এবং ঋণগ্রস্ত কৃষকদের প্রদেয় চড়া সুদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সরকারী আইন কার্যকরী করার পক্ষে এবং পাটের নিয়ন্ত্রিত বাজারের (regulated market) পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকার Agricultural Prices Commission গঠন করেছেন, এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কেনার জন্য Jute Corporation of India গঠন করেছেন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর দেশে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার উল্লেখ করার কারণ হল এই যে সমস্যাটির গভীরতার কথা সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে ; এমন-ই ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হিসাবে ভাষণ দেবার দশ বছর আগে ১৯২৮ সালে যখন সুভাষচন্দ্র Indian Independence League-এর ইস্তাহারে অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন তাতেই তিনি কৃষি সম্পর্কে

সেই লীগের বক্তব্য রেখেছিলেন। তাতে ছিল, (১) একই রকম ভূমি প্রথার প্রবর্তন করা হবে, (২) রাষ্ট্র সমহারে করের ব্যবস্থা করবে (৩) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কৃষিঋণ বাতিল করা হবে এবং (৪) ক্ষতিপূরণের সাহয্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হবে।

যে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের কথা সুভাষচন্দ্র বার বার বলেছেন, গান্ধীজী সে সম্পর্কে নীরব ছিলেন। বরং গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে জমিদাররাও গরীব চাষীদের অছি (Trustees) হতে পারে—যদি তারা তা না হতে চায় তবে গান্ধীজীর মতে অবস্থার চাপেই সংস্কার হবে ; বিশেষ করে পঞ্চায়েতী রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার হবে। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর এই যুক্তি যে স্বাধীনতার পর ধোপে টেকেনি তার প্রমাণ হল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকেই জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য পরিকল্পনা-ভিত্তিক আইন প্রণয়ন এবং গান্ধীশিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের ব্যর্থতা!

সুভাষচন্দ্র কৃষির উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, সেটা ছিল দীর্ঘমেয়াদী। অবশ্য পরাধীন ভারতে দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা ক ।ই স্বাভাবিক ছিল ; কারণ স্বল্পকালীন যে ব্যবস্থার কথাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বলতে পারতেন সেটা কোনো ভাবেই ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হত না। তাছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, তখনকার প্রাদেশিক সরকারগুলির (১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশ যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল) পক্ষে সেই নীতি বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিলনা। অন্ততঃ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতের দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য বড় রকমের বিনিয়োগ করতে আদৌ আগ্রহী ছিলনা, এটা মনে করাই স্বাভাবিক।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার পরও সুভাষচন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস প্রবর্তিত জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র তখন চেয়েছিলেন একটি অ-দলীয় কমিটি গঠন করে দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী তৈরি করতে এবং এজন্য তিনি নিজের বাসভবনে ১৯৩৯ সালের ১লা ডিসেম্বর একটি ঘরোয়া সভা ডাকেন।[৫] যদিও এই সভায় একটি অ-দলীয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। সুভাষচন্দ্র কিন্তু নিশ্চেষ্ট ছিলেননা। ১৯৪০ সালের ৮মে তারিখে একটি বিবৃতিতে তিনি "National Economic Development Board" গঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। এই বোর্ডের কর্মসূচীতে কৃষির উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তা সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল। আমরা এখানে সুভাষচন্দ্রের সেই বিবৃতি থেকে তা উল্লেখ করছি,—"কৃষির উন্নয়নের জন্যআমাদের দেশে নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(ক) জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে মরা বা মজা নদী ও খালের সংস্কার, কোথাও সেচের জলসরবরাহের জন্য, কোথাও বা জমা জলনিকাশের জন্য নূতন জলপথের সৃষ্টি, উপযুক্ত সার সরবরাহ ও চাষের পদ্ধতির এবং নানা প্রকার কৃষিজ উৎপাদনের উন্নতির জন্য প্রয়াস; (খ) ক্ষেতের উৎপাদনের সর্বাধিক ফল যাতে কৃষক লাভ করে তার ব্যবস্থা করা; (গ) আইনের দ্বারা চাষের জমির আরও টুকরো টুকুরো হয়ে যাওয়া (Subdivision of lands) বন্ধ করা, কারো অধিকারে বাড়তি জমি থাকলে তাকে নিম্নমানের জমির মালিকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা; (ঘ) চাষের জন্য সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করা; (ঙ) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় সমবায় সমিতি স্থাপন করা; এই সমিতিগুলি উন্নত ধরনের চাষের উপযোগী বীজ ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে; (চ) কৃষিজ উৎপাদন থেকে লব্ধ আয় যথাসম্ভব সঞ্চয় করবার জন্য কৃষিজীবীদের শিক্ষা দেওয়া; এই সঞ্চয়, চাষ না হলে বা নষ্ট হলে তাদের সাহায্য করবে। পরিবারের উপায়ী মানুষের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা তার মৃত্যু হলে তার নিজের বা পরিবারের জন্য সকলের জীবনধারণের

৫। "Bengal's Economic Development : Proposal for Formation of Non-Party Board", Hindusthan Standard, December 3,1939.

জন্যও এই সঞ্চয় সহায়তা করবে। 'ক' 'খ' 'গ'—এই তিন ধারার বিষয়-গুলি মাত্র সরকারী ভাবেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর। বর্তমান সরকারের নড়াচড়ায় খুবই সময় লাগে। সেই হেতু এই বোর্ড দ্রুত কাজের জন্য ধারাবাহিক প্রচারকার্য চালাবে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সভাসমিতির আয়োজন ও পুস্তিকা বিতরণ করবে এবং সংবাদপত্রে লেখালেখি করবে। 'খ' এবং 'ঙ' ধারার বিষয়গুলির জন্য সরকারী অনুদান প্রয়োজন। বহু প্রত্যাশিত সেই দান কিন্তু মিলছেনা। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে এক্ষেত্রেও বোর্ড প্রচার কার্যের দ্বারা দাবি আদায়ে সচেষ্ট হবে। 'চ' ধারার জন্য অল্প টাকার জীবনবীমার ব্যবস্থা এবং টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করা দরকার; বোর্ড সে ভার নিজেই নেবে।"[৬]

ন্যাশন্যাল ইকনমিক বোর্ডের কর্মসূচী সংক্রান্ত এই বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র কৃষি উন্নয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাগুলির কথা বলেছেন,—তার চেয়ে বিকল্প আর কোনো ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবতে পারিনা। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে কৃষি-ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, ন্যাশন্যাল ইকনমিক বোর্ডের কর্মসূচী তারই একটি সম্প্রসারিত ভাষ্য একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সুভাষচন্দ্র বর্ণিত এই কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী একটি জাতীয় কৃষি-পরিকল্পনার মাধ্যমেই সফল হতে পারত। বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে নূতন কৃষি পদ্ধতি (New Agricultural Strategy) প্রবর্তিত হয়েছে তার কিছু উপাদানের হদিস সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতিতে মিলবে। যদি কেউ মনে করেন যে সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা শুধু বৃহদায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নকেই আঁকড়ে ধরেছিল তবে তিনি ভুল করবেন। ভারত যে কৃষির উপর কত নির্ভরশীল তা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি বা এড়াবার কথা নয়। যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে কৃষি উন্নয়নের জরুরী প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়নি। কৃষির উন্নয়নের জন্য সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা একজন

---

৬। সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির অনুবাদ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" বইয়ে পৃষ্ঠা ১৪৪—১৪৬

পরিণত অর্থনীতিবিদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক নয় যদিও সুভাষচন্দ্র মূলতঃ ছিলেন বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ,—অর্থনীতিবিদ নন।

পাটচাষ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯২৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় তিনি বলেছিলেন বিদেশীর চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপাদন সীমিত করতে হবে যাতে কৃষকদের অর্থাগমের সুবিধা হয়; সে বছরই ২১শে এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনের জামালপুর অধিবেশনে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে ভাষণ দেওয়া কালে তিনি বলেছিলেন, "পাটের চাহিদা যদি কম হয়, দাম পড়ে যাবে ও চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে সমস্ত দেশ দরিদ্র হয়ে পড়বে। চাষী যখন ভালো quality-র পাট উৎপন্ন করে তখন জোর করে তাকে নিকৃষ্ট quality বলা হয় এবং দাম কম দেওয়া হয়—এই ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সাধারণত দাম ঠিক করে কে? যে বিক্রি করে সেই ঠিক করে। কিন্তু পাট সম্বন্ধে সে নিয়ম নয়—এখানে দাম ঠিক করে খরিদ্দার, এই রকম অসম্ভব ব্যাপার কেউ কখনো শোনেনি। এর প্রতিকার করতে হবে। তুলা ও পাট নিয়ে কুটিরশিল্প হতে পারে। চরকা ও তাঁতের সাহায্যে হেসিয়ান তৈরি হতে পারে কিনা ও অল্পমূল্যে বিক্রি হতে পারে কিনা experiment করে দেখতে হবে। যেখানে পাট বিক্রি করে ৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, পাট যারা কেনে—মিলের কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে ৩ কোটি টাকা পায়, যে উৎপাদন করে সে তার সামান্য অংশই পায়। পাট উৎপাদন করে নিজেরা থলে ইত্যাদি প্রস্তুত করে যদি বিক্রি করতে পারি তাহলে লাভ হয়। এর সমাধান যদি করতে পারি বাংলার চেহারা একদিনে বদলে যাবে— বাংলার প্রধান সমস্যা পাট—যে সমস্যার সমাধান না হলে বাঙ্গালী প্রজার অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হবে না।" সে-বছরই ৩০শে মার্চ রংপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় পাটচাষের সংকোচ সাধন করা প্রয়োজন তা কি আর বলে দিতে হবে? যে বছর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ মার্কিন তুলা উৎপন্ন হয়, সে বছর তারা অতিরিক্ত তুলা

নষ্ট করে ফেলে; তথাপি সস্তায় মাল ছেড়ে বাজার খারাপ করে না। আর আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে পাট উৎপন্ন করায় যে দামে তা বিক্রি করতে বাধ্য হই, তাতে পড়তা পোষায় না। পাটের প্রয়োজন যতদিন থাকবে এবং যতদিন পাট উৎপাদন বিষয়ে বাংলার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে ততদিন বাংলা পাটচাষ করে লাভবান হবার চেষ্টা অবশ্যই করবে। কিন্তু যেভাবে আমরা পাট চাষ করছি তাতে লাভ না হয়ে ক্ষতিই হচ্ছে।

"এই পাট সম্পর্কে আর একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। এদেশে কলকাতার উপকণ্ঠে যে সব পাটকল আছে, তার অধিকাংশই বিদেশীয়—এদেশের লোক তথায় কেবল শ্রমিক। যদি মফস্বলে স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো কলের দ্বারা পাটের সূতো প্রস্তুত করা যায় তবে থলে ও চট প্রস্তুত করা কুটিরশিল্প হিসাবে দেশে চালু হতে পারে এবং তাতে বিশেষ উপকার হয়।"

১৯৪০ সালের ৮ই মে (ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার পর) সুভাষচন্দ্র যে National Economic Development Board গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তার কর্মসূচীতে তিনি একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ( Financial Institution) গঠন করতে চেয়েছিলেন, যে প্রতিষ্ঠান সরকারী সহযোগিতা পাওয়া গেলে পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে কাঁচা পাটের সমগ্র উৎপাদন এবং বিপণনের ( production and marketing ) ভার গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ ইতিহাসের স্রোত তখন অন্যদিকে বইছিল।

আধুনিককালে আমরা agro-Industry অথবা কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। সুভাষচন্দ্র তাঁর রংপুর ভাষণে (১৯২৯) এই জিনিসটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

কৃষির উন্নয়ন ছাড়াও সুভাষচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি উক্তি করেছেন যার সঙ্গে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পাই তার আলোচনাকালে আরও একটি জিনিস আমাদের

লক্ষ্য করা দরকার। দেশের মাথাপিছু খাদ্য সরবরাহ একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের যোগানের উপর নির্ভর করে, অপর দিকে সেটা নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার অন্যতম কারণ ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির উঁচুহার। দেশে বেকারী সমস্যার তীব্রতাও ছিল একদিকে কাজের সুযোগের অভাবের জন্য এবং অপরদিকে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্যের জন্য। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত চাপের প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেশে গ্রামীণ বেকার সমস্যা (Rural unemployment) শুধু আজকের সমস্যা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও এই সমস্যা ছিল। একটি খামারে বা জমিতে যে কয়জন লোকের শ্রম বা নিয়োগ দরকার, দেখা যেত তার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক তাতে নিযুক্ত। কেননা, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে একটি খামার বা বিভিন্ন জমির মালিক হয়ত কয়েকজন—কাজেই সবাই সে খামার বা জমিগুলিতে কাজে নিযুক্ত। এক্ষেত্রে মূলধন অপরিবর্তিত রেখে বা চাষে নিযুক্ত লোকদের কর্মক্ষমতা অপরিবর্তিত ধরে নিয়ে যদি কিছুসংখ্যক লোককে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা যেত তবে তাতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমতনা, বরং উদ্বৃত্ত লোকদের অন্যত্র কাজে নিযুক্ত করার চেষ্টা করা যেত। কৃষিক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির সমস্যাকে অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemployment)। এই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত উন্নত শ্রমশক্তির জন্য যে অর্থব্যয় হয় সেটা অনুৎপাদনমূলক (unproductive)। এই অর্থব্যয় এড়াতে পারলে দেশের সঞ্চয় বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যার মূল কারণ কোথায়? মূল কারণ হল, কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ,—এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন হল গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ কমানো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমস্যার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ সুভাষচন্দ্রের ভাষণে বা লেখায় নেই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক কর্ম-সূচীর ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব যে কত বেশী সুভাষচন্দ্র তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর হরিপুরা কংগ্রেসের ভাষণে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "স্বাধীন ভারতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর ক্ষেত্রে প্রথম যে সমস্যার

মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন তা আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। ভারত জনসংখ্যার ভারে পীড়িত কিনা আমি এই তাত্ত্বিক প্রশ্নে যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে যেখানে দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধি দেশের বুকে বিচরণ করছে, সেখানে এক দশকে আমাদের জনসংখ্যার ৩ কোটি বৃদ্ধি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। জনসংখ্যা যদি সাম্প্রতিক অতীতের মতো লাফে লাফে বেড়ে যায় তাহলে আমাদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে পর্যন্ত না আমরা বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি সে পর্যন্ত আমাদের জনসংখ্যা সংকুচিত করা বাঞ্ছনীয় হবে।"[৭]

এক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) কথা প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ না করলেও সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এই পর্যায়ে তা নির্দিষ্ট করে দেবার প্রয়োজন নেই—তবে আমি বলব যে, এই সমস্যার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক"।

সুভাষচন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার ফলে দেশের অর্থনীতির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তার-ই উল্লেখ করেছেন। কৃষির উন্নয়নের উপর এই সমস্যার কী প্রতিক্রিয়া বা চাপের সৃষ্টি হবে সুনির্দিষ্ট ভাবে তার উল্লেখ তিনি করেননি। তবে জনসংখার চাপ কমালে যে খাদ্যাভাব বা অনশনের তীব্রতা কমবে এবং বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের সমস্যাকে প্রত্যাঘাত করার অন্তত একটি রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে যে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ বেকার সমস্যার মধ্যে একটি সূত্র স্থাপন করা যায়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাত্ত্বিক অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী; দেশকে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে টেনে তুলে তার পুনর্গঠনের জন্য তিনি ছিলেন একান্ত আকুল। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন করতে হবে।

৭। সভাপতির ভাষণ—হরিপুরা কংগ্রেস (১৯৩৮)

## দেশের শিল্পায়ন ও জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র

দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় অসহযোগ আন্দোলনের পরেই। তিনি যখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অফ ইণ্ডিয়ার বাংলা শাখার ইস্তাহার প্রণয়ন করেন তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে অসহযোগ কর্মসূচীর সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। জাতির সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে একটি সুসংহত অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রয়োজন সুভাষচন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য সেই ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে—"(১) যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে বৃহদাকার উৎপাদন-ব্যবস্থায় লীগ বিশ্বাস করে; কিন্তু ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। (২) মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা হবে। এবং (৩) রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনের জাতীয়করণ করা হবে।"

বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ এবং ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র যা বলতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ১৯৩৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যা বলেছিলেন,—তারই সূত্র ধরে জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আমরা দেখতে পাই তাঁর পরবর্তী তিনটি ভাষণে—(১) ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনে ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৮, তারিখে প্রদত্ত ভাষণ, (২) ২রা অক্টোবর, ১৯৩৮, তারিখে শিল্পমন্ত্রীদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ, (৩) ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখে নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিটিতে প্রদত্ত ভাষণ।[১]

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়নই যথেষ্ট হবে না। রাষ্ট্রের মালিকানায়

১। এই তিনটি ভাষণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং "প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের রূপরেখা" সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" বইটিতে।

ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। যে পুরাতন শিল্পপদ্ধতি বিদেশের ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশের বৈদেশিক শাসনের ফলে ভেঙ্গে পড়েছে তার পরিবর্তে নূতন শিল্পপদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক কারখানাগুলির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্বদেশী কোনো কোনো শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিধির উৎপাদন উৎসাহিত করা উচিত তা পরিকল্পনা কমিশনকে সযত্নে বিবেচনা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা যতই আধুনিক শিল্পায়ন অপছন্দ করি এবং তার সমবেত কুফলগুলির যতই নিন্দা করি, আমরা আর ইচ্ছা করলেও শিল্প-পূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারি না। সুতরাং আমাদের নিজেদের শিল্পায়নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত এবং তার কুফল যত কম হয় সেজন্য উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। একই সঙ্গে যেখানে কারখানার অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগিতার মুখে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে সেখানে কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে বের করা উচিত। ভারতবর্ষের মতো দেশে কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ করে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাতে সুতাকাটা ও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মতো শিল্পগুলির প্রচুর অবকাশ থাকবে।

"সবশেষে বিবৃত হলেও যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তা এই যে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও ভোগের উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ সামাজিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ কিংবা বহির্দেশীয় ঋণের দ্বারা কিংবা মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা তার জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে হবে।"

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য গভীরভাবে অর্থবহ। সুভাষচন্দ্র জানতেন দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কিভাবে এই শিল্পবিপ্লব আসবে? সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমেই এই শিল্পায়ন হতে পারে এবং এজন্য রাষ্ট্র মালিকানায় ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য। এই রীতি ছিল পুরোপুরি গান্ধী-নীতির বিরোধী। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে দেশের উন্নয়ন-স্বার্থ চিন্তা করা ছিল অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীবাদীরা আধুনিক শিল্পায়ন অপছন্দ করতেন এবং তার কুফলগুলির নিন্দা করতেন। সুভাষচন্দ্রের মতে যেহেতু দেশ আর চেষ্টা করলেও শিল্প-পূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারবেনা, সেজন্য বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন এবং আধুনিক শিল্পায়নকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করতেই হবে এবং দেখতে হবে বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের কুফলগুলি কতটা এড়ানো যায়। সুভাষচন্দ্র কুটির শিল্প-বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে শুধু কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর নির্ভর করে থাকলে দেশ উন্নয়নের পথে এগোবে না। তিনি কৃষি-নির্ভর কুটির শিল্পগুলির ( agro-based cottage industries) উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হলেও ভারতের মতো দেশে কুটির শিল্পগুলির, বিশেষ করে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাতে সুতোকাটা ও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মতো শিল্পগুলির উন্নয়নের প্রচুর অবকাশ থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি, স্বাধীন ভারতে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে তাতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন গুরুভার শিল্প ও মূলধনী শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল অপরদিকে তেমনি দেশে ভোগ-সামগ্রী শিল্পে ( বৃহদায়তন ও মধ্যমায়তন ) এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন পদ্ধতি বহুলাংশে সুভাষচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে চলছে—এখানেই সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব এবং দূরদৃষ্টি। সুভাষচন্দ্রের মতে "পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও ভোগ উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ক্রমশঃ সামাজিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।" সুভাষচন্দ্র জানতেন যে ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটাতেই হবে। কিন্তু ব্রিটেনে যেভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে সেভাবে ভারতকে এগোলে চলবেনা,—ভারতকে এগোতে হবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ( ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৮ ) সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে যে উক্তি করেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য—"We can at best determine whether this

revolution, that is industrialisation, will be a comparatively gradual one, as in Great Britain, or a forced march as in Soviet Russia. I am afraid, it has to be a forced march in this country." অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র রাশিয়া-প্রদর্শিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথেই দেশের দ্রুত শিল্পায়ন যে সম্ভব তাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের আরেকটি দিক এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা ভারতে ছিল না, সুভাষচন্দ্র একথা জানতেন। তবে পরিকল্পনার অর্থসংস্থান কিভাবে হবে? অভ্যন্তরীণ ঋণের কথা তিনি বলেছিলেন, অর্থাৎ, সরকার প্রয়োজনবোধে দেশের ভিতরেই ঋণগ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারেন,। অবশ্যই এক্ষেত্রে খোলা বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে ঋণ সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক নয় এইরকম প্রতিষ্ঠান অথবা ধনী জনসাধারণ (non-banking public) যদি এই ঋণপত্র কেনে তবে তাতে মুদ্রাস্ফীতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এভাবে ভারতের মত অনুন্নত দেশে বিরাট একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য ঋণ গ্রহণের সুযোগ বা সম্ভাবনা যে সীমিত সুভাষচন্দ্র তা জানতেন। সেজন্য তিনি বহির্দেশীয় ঋণ এবং প্রয়োজনবোধে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের কথা বলেছিলেন। অনগ্রসর দেশকে উন্নয়নের পথে এগোতে হলে কিছুটা মূল্য দিতে হয়, এবং সেই মূল্য হল মুদ্রাস্ফীতি যার সৃষ্টি হয় ঘাটতি অর্থসংস্থানের মাধ্যমে (যদি সেই অর্থসংস্থানের জন্য সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, অর্থাৎ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেজন্য দেশে নূতন মুদ্রা ছাড়ে)। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে যদি বর্ধিত মুদ্রা দেশের অব্যবহৃত সম্পদকে উৎপাদন বাড়াবার কাজে ব্যবহার করতে সাহায্য করে এবং যদি মুদ্রাস্ফীতির দরুণ কিছু চাপানো সঞ্চয়ের (forced saving) সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির কথা যদিও তিনি বলেছিলেন,—সেই মুদ্রাস্ফীতি কী পরিমাণ হবে সেকথা তিনি বলেননি। কংগ্রেস সভাপতির

ভাষণে এই বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার অবকাশ হয়ত ছিলনা। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি থাকলেও মূলধনের অভাব থাকায় বৃহদায়তন শিল্পগুলির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি কিনতে গেলে বিদেশ থেকেই সেগুলি আমদানি করার দরকার ছিল। সেজন্য সুভাষচন্দ্র বহির্দেশীয় ঋণের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য তখনকার দিনে কতটা অর্থনীতি-ঘেঁষা ছিল, তার বিচার না করে আমরা শুধু এটুকু এখানে বলতে পারি, আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সঙ্গে তার অর্থসংস্থানের দিকটিও যে বিবেচনা করতে হয় তা তিনি জানতেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের আগে ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশের শিল্পের বিকাশ, জলবিদ্যুৎ, বন্যা নিবারণ, জলসেচের ব্যবস্থা ভূমিক্ষয় নিরোধ, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, প্রভৃতির উপায় নির্ধারণ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি মূল জিনিস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল,—সেটি হল—ভারতবর্ষ জাতীয় পুনর্গঠনে যন্ত্র-শিল্পের সম্প্রসারণ না কুটির শিল্পের উন্নয়ন, কোনটিকে গ্রহণ করবে? সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হবার পর দ্রুত পট পরিবর্তন হয় এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের ভিত্তিতে হবে—তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু এজন্য কুটির শিল্পকে সুভাষচন্দ্র উপেক্ষা করেননি। তবে সুভাষচন্দ্র একথা স্পষ্ট-ভাবে বলেছিলেন যে "আধুনিক যুগে দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করা কুটির-শিল্পের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান একমাত্র পরিকল্পিত যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের দ্বারাই সম্ভব।"[২] কিন্তু এজন্য "কুটিরশিল্পের কথা অবশ্যই ভুলে যাওয়া হবে না; ভারতে তার স্থান থাকবে, যেমন রয়েছে জার্মানী বা জাপানে।"[৩] শিল্পায়ন সম্পর্কে সুভাষ-চন্দ্রের ধারণার পাশাপাশি তখনকার দিনের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতামতের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে

২। Hindusthan Standard, Calcutta, June 8. 1939.

৩। Pioneer, Lucknow, November, 22, 1938

পারে। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের কাছে তুইটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন। প্রথমটি হল,পরিকল্পনায় যেন ভারসাম্য (balance) থাকে,—অর্থাৎ, মূল শিল্পগুলির উন্নতির পাশাপাশি ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উন্নতি যেন ঘটানো হয়; দ্বিতীয়তঃ, সম্প্রসারণশীল শিল্পের উপযোগী সামাজিক কাঠামো তৈরী করতে হ'লে কৃষিজীবীদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। আর তা বাড়তে পারে যদি উপযুক্ত কৃষি পরিকল্পনা করা যায়, যাতে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের সঙ্গে খাদ্যশস্য নয় এমন কৃষিজ-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে।[৪] সুভাষচন্দ্র ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি উপেক্ষা করতে পারেননি। যদি আমরা হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বর্ণিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর কৃষি পরিকল্পনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যুক্তি গ্রহণ করি, তবে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের শেষাংশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার সংঘাত কম থাকারই কথা।

সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় তখন সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালের প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কমিটিকে একটি সর্বভারতীয় শিল্প পরিকল্পনার কমিটিতে রূপান্তরিত করায় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই সেই ভিত্তিতে অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন ডেকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমরা দেখব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার (জুলাই, ১৯৩৮) পরই সুভাষচন্দ্র খোলাখুলিভাবে দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পায়ন কিরূপ হবে সে সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯৩৮ সালে ২১শে আগষ্ট Indian Science News Association-এর সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে যন্ত্র-শিল্পায়নের পরিকল্পনাকেই বোঝাবে।" কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানতেন যে তাঁর এই

৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু—"সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" পৃষ্ঠা-১১৬,
শ্রীবসু এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, Madras Mail, November 23, 1938 এবং Amrita Bazar Patrika Nov. 24, 1938 সংখ্যা থেকে।

অভিমত কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতাদের মত নয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজে মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করতেন তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতেন। কেন তিনি যন্ত্র-শিল্পায়নের সমর্থক? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র উক্ত সভায় বলেছিলেন, তিনি যন্ত্র শিল্পায়নের সমর্থক নিম্নোক্ত কারণে, যেহেতু উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষিব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ করা হবে, সেজন্য বেকারী বেড়ে যাবে,—কৃষির যন্ত্রীকরণের জন্য যারা বেকার হবে তাদের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য শিল্পায়ন খুব প্রয়োজন। ভারত ভবিষ্যতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে—সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে পরিকল্পিত শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দেশের শিল্পগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ দরকার; তাতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে।

সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ডক্টর মেঘনাদ সাহার ভাষণের উত্তরে বলেন, "যদিও আমি কুটির-শিল্প বর্জনের পক্ষে নই এবং যদিও আমি বলেছি যে যেখানে সম্ভব কুটিরশিল্পগুলিকে রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাতে হবে, তবু আমার অভিমত এই যে ভারতের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তাৎপর্য বহুলাংশে হওয়া উচিত সারা দেশের জন্য শিল্পায়ন পরিকল্পনা রচনা। আর আপনারা এবিষয়ে একমত হবেন যে স্যার জন অ্যাণ্ডার্সন যেমন আমাদের বিশ্বাস করাতে চান, তেমনভাবে শিল্পায়নের অর্থ ছাতার বাঁট ও কাঁসার থালা তৈরি করা নয়,"

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি নিয়ামক নীতির (guiding principles) কথাও উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি হল, দেশকে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বয়ম্ভরতার পথে নিয়ে যাবার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন। এজন্য মূল শিল্পগুলির, কথা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগের বস্তু নির্মাণ প্রভৃতির বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে থাকবে শিল্পবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা। শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপারে অথবা সরকারী হস্তক্ষেপ নিবারণ করতে হবে এবং এজন্য একটি স্থায়ী গবেষণা সংস্থা থাকবে। জাতীয়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্বে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালানোর প্রয়োজনীয়তার উপরও সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র আরও বলেন, "আমাদের কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি গবেষণার সমস্যারও সম্মুখীন হতে হবে। কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে এটা সর্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃত হবে যে জাপানী ছাত্রদের মতো আমাদের ছাত্রগণকে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো উচিত যাতে তাঁরা ভারতে ফিরেই সরাসরি নূতন শিল্প গড়ার কাজে অগ্রসর হতে পারেন।"

১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর এবং ৩রা অক্টোবর কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে গৃহীত প্রস্তাবগুলি আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে-বছর ডিসেম্বর মাসে যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটির কর্মসূচী এই প্রস্তাব-গুলির উপর ভিত্তিশীল ছিল।

১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে যে ভাষণ দেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল, :—[৫]

"আমাদের আজকের জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা যখন এত বিরাট আকার ধারণ করেছে, আমার এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের যাবতীয় সহায়সম্বলকে জাতির সর্বাধিক উপকারে নিয়োগ করার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের কৃষি সমাজের নিদারুণ দুর্দশার অবসান ঘটানো এবং জীবিকার সাধারণ মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিতেই তা সম্ভব হবে না। কৃষি পদ্ধতিতে অধিকতর নৈপুণ্য নিশ্চয় বাঞ্ছিত, তার দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে এবং সস্তায় আমরা খাদ্য পেতে পারি ঠিক, কিন্তু এই উপায়ে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটা বিরুদ্ধার্থক মনে হতে পারে,

কিন্তু সামান্য বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, আরও বেশি নৈপুণ্যের অর্থ দাঁড়াবে এখনকার থেকে কম সংখ্যক কৃষকদের দিয়ে একই পরিমাণ কৃষির উৎপাদন। তাই যদি হয় বৈজ্ঞানিক কৃষির ফলে এখন বেকার সমস্যার যা পরিস্থিতি তা আরও শোচনীয় হতে পারে।

"এই দারুণ সমস্যাকে আমরা তাহলে কিভাবে আয়ত্তে আনব? আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক—নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে—যাতে আরও ভালো পরতে পায়, আরও ভালো শিক্ষা পায়, বিশ্রাম ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যথেষ্ট অবসর পায়। এই লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে, অপরিহার্য কাজগুলিকে সংগঠিত করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার বিরাট অংশকে শিল্প সংক্রান্ত নানাকাজে নিয়োজিত করতে হবে।

"ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার সঙ্গতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অফুরন্ত তার ধাতব সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্ভাবনা। দরকার দেশের সর্বাধিক স্বার্থে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিতভাবে আমাদের সেগুলি কাজে লাগানো। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যারা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তারা পুরোমাত্রায় তাদের শিল্পবিকাশের মধ্য দিয়েই তা হয়েছে। এখানে আমি একটিমাত্র দেশের কথা উল্লেখ করব। মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা ভারতের চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিল না। সে দেশ ছিল প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭ ভাগ ছিল কৃষক এবং আজকের আমাদের কৃষকরা যেমন প্রায় তেমনই ছিল তারা দুঃস্থ ও হতভাগ্য। শিল্প ছিল অনগ্রসর অবস্থায়, প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদন তেমন বিকাশলাভ করেনি এবং এই শক্তির ব্যবহার বিলাসিতা বলে গণ্য হত। দেশের শক্তি-সম্ভাবনা সম্পর্কে না ছিল জ্ঞান, না ছিল তেমন বিশেষজ্ঞ বা প্রয়োগকুশলী। কিন্তু গত ষোল বছরের মধ্যে নিরন্ন চাষীদের সেই দেশ সুপুষ্ট ও সুসজ্জিত শিল্প শ্রমিকদের এক দেশ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য, রোগ ও যে দুর্ভিক্ষের সমস্যা বিপ্লবের আগেকার কৃষিসমাজের উপর নিয়ত ভর করে থাকত, সেইসমস্যা সমাধানের প্রয়াসে সে দেশ বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এর প্রধান কারণ দেশব্যাপী সুপরিকল্পিত শিল্প পরিকল্পনা, যার জন্য

আগে থেকে ভাবতে হয়েছে বৈদ্যুতীকরণের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার কথা।··· কেবলমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের মিল আছে বলেই সে-দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। সেইসঙ্গে এটাও দেখাতে চেয়েছি, সুবিন্যস্ত শিল্প পরিকল্পনা সর্বাত্মক সমৃদ্ধির পথে আমাদের কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ক্ষমতা দখল আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে এসে পড়েছে এবং স্বরাজ আর স্বপ্ন মাত্র নয় যা সুদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে, এই কথা বিবেচনা করে আমরা যারা কংগ্রেস-সেবক আমাদের কেবলমাত্র স্বাধীনতার প্রয়াস করলেই চলবে না। আমাদের চিন্তার ও সামর্থ্যের কিছু অংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাতেও নিয়োজিত করতে হবে। জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায়। ···আমার মতে আমাদের প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়, শিল্প পরিকল্পনা।···শিল্প বিপ্লবের যন্ত্রণা আমরা যতক্ষণ না পার হয়ে যাচ্ছি, শিল্পে কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিল্প বিপ্লব যদি অশুভ হয়, সেই অশুভ প্রভাব আবশ্যক। অন্যান্য দেশে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল দেখা দিয়েছে, আমরা কেবল সাধ্যমত তা লাঘব করার চেষ্টা করতে পারি।

"এখানে আমি যথেষ্ট পরিস্কার ভাবে বলে রাখতে চাই, কুটির শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের বিরোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এরকম বিরোধ যদি থাকে, তার কারণ বোঝার ভুল। কুটির-শিল্প উন্নয়নের যে প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, যদিও সেই সঙ্গে আমি এটাও মনে করি, শিল্প পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। আমরা দেখেছি ইউরোপের প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও বহুসংখ্যক কুটির শিল্প এখনও রয়েছে এবং ভালোভাবেই চলছে। আমাদের দেশেও আমরা এই রকম অনেক কুটির শিল্পের কথা জানি—যেমন তাঁত শিল্প—যা ভারতীয় ও বিদেশী মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে এবং একটুও হটে আসেনি। অতএব শিল্প পরিকল্পনার অর্থ এই নয় যে আমরা কুটির শিল্পের দিকে পেছন ফিরে থাকব। মোটেই তা নয়। এর অর্থ কেবল এই যে, আমাদের স্থির করে নিতে হবে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে কোন্

কোন্ শিল্পের এবং বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। ভারতে বর্তমানে যে অদ্ভুত ধরণের জাতীয় অর্থনীতি চালু রয়েছে সেই দিক থেকে এবং আমাদের দেশবাসীর সীমিত সামর্থ্যের কথা মনে রেখে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন করতে পারলে আমরা সবচেয়ে উপকৃত হব।

"শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—গুরুভার শিল্প, মাঝারি শিল্প এবং কুটির শিল্প। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে বর্তমানে গুরুভার শিল্পের মূল্য যে সর্বাধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুরুভার শিল্পই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দুর্ভাগ্য ক্রমে এইদিকে আমরা বেশি অগ্রসর হতে পারছি না, অন্ততঃ যত-দিন কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতা দখল করে আমাদের রাজস্ব নীতি নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার না পাচ্ছি। মাঝারি ধরনের শিল্পগুলি প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে আরম্ভ করতে পারে। কুটির শিল্প সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি বৃহৎ শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে এই দুই প্রকার শিল্পের উন্নয়নের বিরোধ থাকার কোনই কারণ নেই।"

জাতীয় পরিকল্পনার মূল নীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনে যে কথাগুলি বলেন তার উল্লেখ অন্যত্রও আছে। জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করাকেই তিনি জাতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর মতে যাতে শক্তি সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ তৈরি, মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, পরিবহন ও যোগা-যোগ শিল্প,—প্রভৃতি মূল শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন হয় এইরকম নীতি গ্রহণ করা উচিত। সম্মেলনের ভাষণে সুভাষচন্দ্র কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা পরিষদ গঠন করা এবং তৎকালীন শিল্প পরিস্থিতির উপর একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালাবার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয় হিসাবে সুভাষচন্দ্র ছয়টি সমস্যার প্রতি শিল্প-মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেগুলি হল, (১) প্রতিটি প্রদেশে একমত অর্থনৈতিক সমীক্ষা করার ব্যবস্থা। (২) কুটির শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ

শিল্পের সমন্বয়সাধন, যাতে উভয়ে একই ক্ষেত্রে ব্যাপৃত না থাকে। (৩) আঞ্চলিক ভাবে শিল্প বণ্টন করার যৌক্তিকতা। (৪) আমাদের ছাত্রদের ভারতে এবং বিদেশে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ; (৫) কারিগরি গবেষণার যথোচিত ব্যবস্থা ; এবং (৬) শিল্প পরিকল্পনার সমস্যা সম্পর্কে আরও পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যৌক্তিকতা"। কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের মধ্যে এই সম্মেলনে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী ভি ভি গিরি ( যিনি পরবর্তীকালে স্বাধীন-ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন )। ভি. ভি. গিরির মতে পরিকল্পনার অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযথা প্রতিযোগিতার সংঘাত থাকতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ জিনিসের অতি-উৎপাদন (over-production) হতে পারে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবং দেশ থেকে বিদেশে টাকা চলে যাওয়া বন্ধ করার জন্য একটি পরিকল্পিত অর্থনীতির বিশেষ প্রয়োজন। ভি. ভি. গিরির বক্তব্য এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের হাত শক্ত করেছিল।[৬] এই সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় সেগুলি সুভাষচন্দ্রেরই চিন্তার প্রতিফলন সন্দেহ নেই। এখানে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।[৭]

প্রথম প্রস্তাবে শিল্পমন্ত্রীদের এই সম্মেলনে একমত হয়েছিল যে দারিদ্র্য ও বেকারী, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শিল্পায়ন ভিন্ন কখনই করা সম্ভব নয় এবং এজন্য অন্যতম পদক্ষেপরূপে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এই পরিকল্পনায় মূল ও গুরুভার শিল্প ( basic and heavy industries ) মাঝারি শিল্প এবং কুটিরশিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে

জাতীয় প্রয়োজনে দেশের সম্পদ এবং দেশের বিচিত্র পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে। জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বপ্রকার নূতন শিল্প গঠনের ব্যবস্থা থাকবে সেই অঙ্গে চালু শিল্পগুলিরও উন্নতির ব্যবস্থা থাকে। এই সম্মেলনে দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের অভিমত বিচার করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যে সমগ্র ভারতের জন্য সর্বাত্মক শিল্পায়নের পরিকল্পনা যতক্ষণ বিবেচনাধীন থাকবে এবং উপস্থাপিত না হবে, তার আগেই জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত গুরুভার শিল্পগুলি অবিলম্বে প্রবর্তন করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা দরকার; এই শিল্পগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে এবং সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা যথাসম্ভব আহ্বান করে সমন্বিত করতে হবে :—

(ক) কলকারখানার যন্ত্রপাতিসহ সকল প্রকার যন্ত্র নির্মাণ (খ) মোটরগাড়ি ও মোটর বোটের কারখানা নির্মাণ, সেই সঙ্গে পরিবহন এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্প স্থাপন; (গ) বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুর শিল্প স্থাপন; (ঘ) গুরুভার রসায়ন (heavy chemicals) শিল্প এবং সার শিল্প স্থাপন; (ঙ) ধাতু শিল্প স্থাপন; (চ) বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি উৎপাদন এবং সরবরাহ করার জন্য শিল্প স্থাপন।

এই সম্মেলন তার তৃতীয় প্রস্তাবে উপরোক্ত প্রস্তাব দুটির রূপায়ণের প্রাথমিক কার্যক্রমে একটি পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করেছিল এবং কংগ্রেস সভাপতিকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করার। এই কমিটি যাতে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে পারে সে জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করার অনুরোধ এই সম্মেলন জানিয়েছিল। সম্মেলনে ঠিক হয়েছিল যে এই কমিটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে এবং তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে চার মাসের মধ্যে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হবার কথা ছিল তার কাছেও কমিটি রিপোর্ট দেবে।

এই সম্মেলনেই ঠিক হয় যে বৃটিশ ভারতের প্রদেশ সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য নিয়ে পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়া উচিত, যার কাজ হবে পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ

গুলিকে যথাযোগ্য বিবেচনা করার পরে কার্যকরী ব্যবস্থা করা। এই সর্বভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের নাম ঠিক করা হয়েছিল "The All India National Planning Commission". ঠিক হয়েছিল, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হবে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ; সদস্য কো-অপ্ট (Co-opt) করার ক্ষমতাও কমিশনের থাকবে,—(ক) যেসব প্রদেশ কিংবা দেশীয় রাজ্য সহযোগিতা করবে তাদের একজন করে মনোনীত প্রতিনিধি ; (খ) ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স ( Federation of Indian Chamber of Commerce)-এর চারজন প্রতিনিধি, (গ) নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের একজন প্রতিনিধি এবং (ঘ) সম্মেলনের তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত পরিকল্পনা কমিটির সদস্য। সম্মেলন এই প্রস্তাব করে যে সর্বভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। সেই সভায় কমিশন নিজ সভাপতি নিয়োগ করবে। তিনি যদি ইতিমধ্যেই কমিশনের সদস্য না হয়ে থাকেন তবে তিনি পদাধিকারে সদস্য হয়ে যাবেন।

জাতীয় পরিকল্পনার কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারিশ সহ সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ঃ

"(ক) শিল্পের স্থান নির্ণয় : কোন্ স্থানে বা স্থান" সমূহে কোনো বিশেষ শিল্প স্থাপিত হবে তা নির্ণয়ের কালে কাঁচা মাল সরবরাহ, অন্যান্য স্থানীয় স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে ;

"(খ) শিল্প সংগঠনের নীতি : শিল্পটি কি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে থাকবে না কি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হবে ? শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য কি ধরনের হবে ?

"(গ) শিল্প পরিচালনা এবং তার অর্থভিত্তির নীতি।"

দেখা যাচ্ছে, এই প্রস্তাবে ভারতের মত বিরাট দেশে শিল্প স্থানিকতার ( location of industry) সমস্যাটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া শিল্প সংগঠনের নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে আধুনিক মিশ্র অর্থনীতির ( Mixed Economy ) পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে "সহযোগিতায় স্বীকৃত প্রতি প্রদেশ এবং

দেশীয় রাজ্য প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য প্রারম্ভিক অর্থ সাহায্য করবে।" সম্মেলনে এটাও ঠিক হয় যে সর্বভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়া মাত্র তৃতীয় প্রস্তাবের দ্বারা গঠিত প্ল্যানিং কমিটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং কমিশনের কাছে ঐ কমিটি তার কার্যকালে সংগৃহীত তথ্য, উপাদান, বিবরণ প্রভৃতি হস্তান্তর করে দেবে।

সর্বভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী শ্রী ভি. ভি. গিরিকে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁকে কমিশনের প্রথম অধিবেশনের আহ্বায়ক করা হয়।

শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাব: "এই সম্মেলনের অভিমত, শিল্প ও বিদ্যুৎ শক্তির জন্য অ্যালকোহল ভারতেই উৎপাদিত হওয়া উচিত। এজন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, প্রধানত চিটেগুড় ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যা বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে—তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত।

"এই সম্মেলন একথা শুনে গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করছে যে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশ শক্তি-উৎপাদন এবং শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করছে। এই সম্মেলনের অভিমত, শক্তি-শিল্প প্রবর্তনের ও বিকাশের ব্যাপারে সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা করা উচিত, যাতে তা সর্বভারতীয় পরিমাপে সংগঠিত হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন সুপারিশ করছে, সারা ভারতে যেন গাড়ি চালাবার জ্বালানি হিসাবে পাওয়ার অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশ্রিত নয় এমন পেট্রলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।"

এই সম্মেলনের ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে ক্রয়-বিক্রয় শিল্প, গবেষণা, শিল্প বাণিজ্যের বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও বিনিময়, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রভৃতি বিষয়ে সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পর সহযোগিতা করা উচিত। সম্মেলনের সর্বশেষপ্রস্তাবে অটোমোবাইল পরিকল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করে সুপারিশ করা হয় যেন প্ল্যানিং কমিটি এই পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে তাদের সুপারিশ জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পেশ করে।[৮]

৮। কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের মূল প্রস্তাবগুলি Times of India, পত্রিকায় ৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে চেয়ারম্যান ছাড়া আরও নয়জন সদস্য থাকার ব্যবস্থা ছিল। বোম্বাই সরকার কমিটিতে চারজনের নাম পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন, আমেদাবাদ মিল মালিক সঙ্ঘের শেঠ কস্তুরভাই লালভাই, বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, অর্থনীতিবিদ শ্রী কে. টি. শাহ্ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর ঘোষ। তাছাড়া ছিলেন স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাইয়ে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে। যদিও কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল, তবুও সুভাষচন্দ্র জওহরলাল নেহরুকে সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে নিজে প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধন করলেন।[৯] প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ছাড়া নিম্নলিখিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, শ্রীঅম্বালাল সরাভাই, শ্রী এ. ডি. শ্রফ, শ্রী কে. টি. শাহ্ ডক্টর ভি. এস. দুবে এবং আহ্বায়ক শ্রী ভি. ভি. গিরি। বিশেষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রী ভুলাভাই দেশাই, শ্রী জে. বি. কৃপালনী, শ্রী যমনদাস বাজাজ এবং অধ্যাপক সি. এন্. ভকিল।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধন করে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর যে ভাষণ দেন সেটি তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার একটি সুনির্দিষ্ট

৯। ডক্টর মেঘনাদ সাহা শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত ছিলেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁর "Rethinking our Future" বইয়ে বলেছেন যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে সভাপতিত্ব করার জন্য স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। ডক্টর সাহার ভাষায়, "তাঁকে বুঝিয়েছিলাম—একজন প্রথম সারির কংগ্রেস-নেতাকে সভাপতি না করলে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং, কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত থেকে যাবে, কংগ্রেসের কাছে তার কোনো মূল্যই থাকবে না। সেই মহান্ প্রবীণ ব্যক্তি আমার কথায় সারবত্তা বুঝে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। আমার পরামর্শ মতই পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে (তখন ইয়োরোপে) ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানানো হল।"

প্রতিফলন। এই ভাষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে তার প্রায় সর্বাংশ এখানে উল্লেখ করছি।[১০]

"গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি লক্ষ্য করছি, ১৯২১ সাল থেকে নিখিল ভারত চরকা সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের উদ্যোগে যথাক্রমে খাদি উৎপাদন ও কুটির শিল্প উন্নয়নের যে আন্দোলন চলে আসছে তার উপরে শিল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে সেই নিয়ে কোন কোন মহলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, দিল্লীতে উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই।

বস্তুতঃপক্ষে, তিনটি শ্রেণীতে আমি শিল্পকে ভাগ করি ; কুটির, মাঝারি পর্যায়ের ও বৃহৎ পর্যায়ের শিল্প এবং আমি এমন একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য আবেদন করি যা এই শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটির কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেবে। শুধু তাই নয়, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনেও আমরা নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংঘের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধির জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছি। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি একথা বলা হয় এমনকি যদি আশঙ্কাও করা হয় যে, জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের উদ্যোক্তারা কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে বানচাল করতে চান তাহলে আমাদের উপর দারুণ অবিচার করা হবে।

"প্রত্যেকে জানে, না জানলেও প্রত্যেকের জানা উচিত, ইউরোপ ও এশিয়ার যে সব দেশ সবচেয়ে শিল্পোন্নত, যেমন, জার্মানি ও জাপান, সেখানেও প্রচুর কুটির শিল্প আছে। এবং তাদের অবস্থা বেশ ভালোই ; তাহলে আমাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা থাকবে কেন ?

"এখন আমি কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য

১০। ১৯৩৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধনী ভাষণ—সুভাষচন্দ্র বসু, সুভাষ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড থেকে গৃহীত।

করতে চাই। বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে মূল শিল্পগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; কেননা সেগুলির লক্ষ্য হল উৎপাদনের উপায় ( means of production ) প্রস্তুত করা। অনেক সস্তায় ও তাড়াতাড়ি যাতে উৎপাদন সম্ভব করা যায় সেইজন্য মূল শিল্পগুলি কারিগরদের হাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তুলে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমরা বারাণসী শহরে বিদ্যুৎচালিত তাঁত সহ প্রতি ইউনিট দুই পয়সা হারে বিদ্যুৎ শক্তি দিতে পারতাম তাহলে কারিগরদের পক্ষে নিজেদের বাড়ীতে বসে বর্তমান উৎপাদন হার অপেক্ষা প্রায় পাঁচ কিংবা ছয়গুণ বেশি হারে শাড়ি ও সূচিকার্য করা ও বিভিন্ন ধরনের কাপড় বোনা সম্ভব হত। তাতে তাঁরা একই ধরনের বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের সঙ্গে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারতেন। ভালোমত একটি বিপণন সংস্থা এবং কাঁচামাল যোগান দেবার জন্য একটি সংগঠন থাকলে যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে এই কারিগররা আছে তা থেকে তাদের উদ্ধার করা যেতে পারে। এই একটি মাত্র উদাহরণই যে আমি দেখাতে পারি তা নয়, যদি জাতীর কল্যাণের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শিল্প রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে এই দেশে কারিগর শ্রেণীর লোকেরা ইউনিট হিসাবে-তাদের নিজ নিজ পরিবারের লোকদের নিয়েই হালকা ধরনের বহু শিল্প—যেমন সাইকেল, ফাউন্টেন পেন ও খেলনা—তৈরি করা আরম্ভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জাপানে এইরকমই করা হয়েছে। তাদের সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে এই ঘটনার উপর যে যেখানে বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতি খুব সস্তা এবং জাপানী সরকার কাঁচামাল সরবরাহ ও উপযুক্ত বিপণনের জন্য বোর্ড ( marketing board ) গঠন করেছেন।

"আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের তাঁত শিল্প ও রেশম শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার এটাই একমাত্র উপায়। যে-কোনো সুস্থ শিল্প পরিকল্পনায় মূল শিল্পগুলির উচিত কুটির শিল্পগুলিকে সরবরাহের দ্বারা পুষ্ট ও উন্নত করে তোলা। এই মূল শিল্পগুলিকে বিদেশী সংস্থার হাতে রাখা চলেনা এবং যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের হাতে এগুলির থাকা উচিত, যদিও মূল

শিল্পগুলির অধস্তন শিল্পগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে।

"জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মুখোমুখি হতে হবে এরূপ সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির উল্লেখ এখন আমি করতে চাই, কমিটিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে মূল শিল্পগুলির দিকে অর্থাৎ সেই সব শিল্প যেগুলি অন্যান্য শিল্পকে চালায়···যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প, ধাতু উৎপাদন শিল্প, ভারী রসায়ন শিল্প, যন্ত্রপাতি এবং রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি যোগাযোগ শিল্প। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহে ভারত অনগ্রসর। বিশেষ করে বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে ভারত যে কত অনগ্রসর, তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে ভারতে যেখানে বর্তমানে মাথা পিছু সাত ইউনিট বিদ্যুৎ আছে, সেখানে মেক্সিকোর মতো অনগ্রসর দেশেও মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ ছিয়ানব্বই ইউনিট আর জাপানে তো আছে মাথা পিছু প্রায় পাঁচশো ইউনিট। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এ দেশের সরকার শুধু অর্থের অপচয় করেছেন। অন্য দেশে অনুরূপ একটি পরিকল্পনায় যে ব্যয় হয়, সরকার সে ব্যয় অপেক্ষা দশগুন বেশি টাকা খরচ করেছেন—মাণ্ডি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা ধরুন।

"আমি দাবি জানাই যে যুদ্ধের দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে-বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে আমাদের সরবরাহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যন্ত্রপাতি নির্মাণব্যবস্থার একটা তদন্ত হওয়া উচিত। যাঁরা বলেন যে ভারতে উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা সম্ভব নয় তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই—কারণ ভারতে কাঁচামালের অভাব যেমন নেই, তেমনই অভাব নেই ফোরম্যানও কারিগর শ্রেণীর মানুষের।

"অন্যান্য যে-সব মূল শিল্পে তদন্ত হওয়া উচিত সেগুলি হল জ্বালানি শিল্প, ধাতু-উৎপাদন শিল্প ও ভারী রসায়ন শিল্প। এই-সব ক্ষেত্রে দেশের সম্পদ যথোচিত ভাবে অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি এবং সামান্য যা কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে তা-ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিদেশীদের দ্বারা এবং তার ফলে প্রভূত অপচয় ঘটছে। জ্বালানি শিল্পের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে সত্য।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বোর্ড গঠন করা উচিত এবং জাতীয় ভিত্তিতে জ্বালানি গবেষণার জন্য—একটি গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলা উচিত।

"ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত করে তুলতে হলে ধাতুর উৎপাদন দশ থেকে বারোগুণ বাড়াতে হবে। ভারতের সৌভাগ্য এই যে এখানে সকল শ্রেণীর ধাতুর পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র লোহা ও কিছু পরিমানে তামা ছাড়া অন্যান্য ধরনের ধাতু নিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি।

"যে অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্প বর্তমানে পুরোপুরি বৈদেশিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সে বিষয়েও তদন্ত হওয়া উচিত। শেষ শিল্পটি হল পরিবহন ও যোগাযোগ শিল্প এবং তাদের আওতায় পড়ে রেলওয়ে, জাহাজ, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বেতার প্রভৃতি। বর্তমানে রেলওয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক এবং এই বোর্ড পুরোপুরি ইউরোপীয় পরিচালনাধীন। রেলওয়ের প্রয়োজনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রে এই দেশে তৈরি হয়ে থাকে। নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমুদ্রোপকূলের জাহাজ ছাড়া পুরো জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা অযৌক্তিক সুবিধাভোগী অ-ভারতীয়দের হাতে। বেতার সম্বন্ধেও তার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য একটি বিশেষ সাব-কমিটি নিযুক্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি।

"দেশের শিল্পায়ন প্রসঙ্গে গবেষণা সংস্থা, বৈজ্ঞানিক শিল্প বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব হওয়া উচিত।...

সবশেষে, আমাদের শিল্পায়নের পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঋণ পাওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আমাদের সকল পরিকল্পনা কাগুজে পরিকল্পনা হয়েই থাকবে এবং শিল্প প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা মোটেই অগ্রসর হতে পারবনা।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধনী-ভাষণে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র কুটিরশিল্পকে মোটেই উপেক্ষা করেননি। বরং জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি

দেশে অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেভাবে ক্ষুদ্রশিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে, আমাদের দেশেও সেগুলিকে সেভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। বিশেষ করে, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় টি'কে থাকতে পারে—এ ধরনের শিল্প (যেমন, তাঁত শিল্প, হাতের কাজ, নকশাকাটা তাঁত ও শিল্কের কাপড়) প্রভৃতির যাতে আরও উন্নতি হয় তিনি তাই চেয়েছিলেন। সাইকেল উৎপাদন, নানাধরনের খেলনা এবং হস্ত-শিল্পের উন্নয়নও যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে তিনি তারও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বৃহৎ শিল্পগুলির উপর। করেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিল্পায়ন ছাড়া দেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে যাবেনা। তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণের তিনি সমর্থক ছিলেন; তবে সেক্ষেত্রে যে কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সৃষ্টি হবে এবং তারা যে শিল্পক্ষেত্রে কাজের আশায় শহরে ছুটে আসবে তা তিনি জানতেন। শুধু তা-ই নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এবং অধিক আয়ের আশায়ও বহু শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে।[৯] তাদের কর্মসংস্থানের জন্যও যে দেশে শিল্পায়ন খুব জরুরী সুভাষচন্দ্র সেটা অনুভব করতেন। তাঁর মতে শিল্প-ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করতে অনেকে সাহায্য করবে। যদি আমরা বিশিষ্ট অর্থবিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত Athur Lewis-এর "Economic Development with Unlimited Supply of Labour"[১০] শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করি তবে আমরা দেখতে পাই কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে উদ্বৃত্ত কৃষকরা যখন কাজের আশায় শহরে চলে আসে তখন কিভাবে শিল্প-সম্প্রসারণের মাধ্যমেই তাদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের

৯। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানে Todaro বর্ণিত Rural-Urban Migration Model অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১০। W. A. Lewis—"Economic Development with Unlimited Supply of Labour"—Manchester School, January 1954.

প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি শূন্য অথবা প্রায় শূন্য, তাদের মজুরিও অত্যন্ত কম; অথচ তারা সংখ্যায় উদ্বৃত্ত। এই স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের পথে কোনো প্রকারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই সম্ভব—তার বেশি মজুরি তারা পায়না। এরা যে পর্যায়ে থাকে তাকে বলা যেতে পারে subsistence sector; এদের সদ্ব্যবহার করে, অর্থাৎ স্বল্প মজুরি প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার করে পুঁজিভিত্তিক ক্ষেত্রে (capitalist sector) সম্প্রসারিত হতে পারে এবং তাতে শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের মূলধন সৃষ্টি সম্প্রসারিত করতে পারে। সুভাষচন্দ্র মূলতঃ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না বলে এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যেতে চাননি। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য শিল্পায়ন যে অপরিহার্য তার উপর জোর দিয়েছিলেন,—এবং আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা আছে। দেশের মূল শিল্পগুলির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে,—এই সত্যটি সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া জাতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্বাস পরবর্তীকালে বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্রান্ত বলে গৃহীত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার সম্পর্ক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি করা পর্যন্ত। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হবার পরই কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংঘাত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিকল্পনার সমর্থনে সুভাষচন্দ্র সারা দেশে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র বর্ণিত শিল্প-পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি চলছিল, ইংরেজ শাসন সমর্থনকারী পত্রিকাগুলি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে দেশে প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে যাবার একটি ঝোঁক বা প্রবণতা সঞ্চারিত হবে। বোম্বাইয়ের Times of India কাগজে প্ল্যানিং সম্বন্ধে কংগ্রেসের এবং সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশস্তি করেও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে

দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। "এতদিন ব্যক্তিগত প্রয়াসে শিল্প প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিবেচনা করে শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছিল; পত্রিকায় প্রশ্ন করা হয়েছিল ? এখন কি তার থেকেও এগিয়ে যাওয়া হবে —সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তার পথ নেওয়া হবে ? সরকার কি মোটর গাড়ী নির্মাণ বা বিদ্যুৎশিল্পের অ্যালকোহল প্রস্তুতের মত ভারী শিল্প প্রবর্তনের ভার নিবে—তার সমস্ত আর্থিক ঝুঁকি সহ ? তাই যদি হয়, করদাতাদের খোলাখুলি সেকথা জানানো হোক্, তারা জানুক যে শিল্পে সয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কতখানি মূল্য তাকে দিতে হবে। মূল্য যথেষ্টই দিতে হবে কারণ ব্যাপারটা লাভজনক হবে না। তাছাড়া যে সর্বাত্মক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে, তা কোন্ ধরনের হবে—জার্মান মডেলের না সোভিয়েত মডেলের ? যদি এই দুটোর কোনটিই বাঞ্ছনীয় না হয়, পরিকল্পনা কমিশনের এমন একটি সীমারেখা তৈরি করে দেওয়া উচিত যার পর আর আর্থিকভাবে লাভজনক নয় এ ধরণের প্রকল্প আর নেওয়া হবে না··· অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।"[১১] Times of India পত্রিকার এই আশঙ্কার মূল কারণ ছিল, বোম্বাইয়ের পার্শী, গুজরাটিদের ব্যবসায়িক স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

১১। "Are we now to go beyond this, to commit ourselves to a system of national Socialism in which onus of risk will be taken over from the private investor, and Government will virtvally such large scale schemes as the manufacture of motor cars and power alcohol ? If so, let us define our attitude at the outset. Let the taxpayer know whether he is to be called upon to shoulder the burden of potential loss in these and other directions and let the consumer be told frankly that India's aim is self-sufficiency and he must be prepared to pay the price. If the State is to assist industry, let us be assured that it will share in the profit, as well as indemnify industrialists against loss. Is the object in view—totalitarianism on the German model or state control of the Soviet

১৯৩৮ সালে ২রা অক্টোবর শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে যাবার পর কলকাতার The Statesman ২৭শে অক্টোবরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ("An Industrial Survey") জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করার ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকার প্রশংসা করেছিল; তবে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার বিরুদ্ধে পত্রিকাটি সমঝেও দিয়েছিল। বোম্বাইয়ের মোটরগাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা এই পত্রিকার মতে তখনকার ভারতে ছিল "too speculative a scheme". পত্রিকাটির মতে ভারতের শ্রমিকরা ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের মত এত দক্ষ নয় যে দেশে তারা মোটরগাড়ী তৈরি করতে পারবে।

Madras Mail পত্রিকাটি দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেছিল গান্ধীজীর পশ্চাদগামী অর্থনৈতিক ধারণার সঙ্গে একমত নন এমন লোক কংগ্রেসে আছেন, বিশেষ করে কংগ্রেস সভাপতি, যিনি বিশ্বাস করেন যে দেশকে এখন আর গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, কিন্তু দেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রগতির সামিল করতে হবে,—দরকার হলে জোর করেই তা করতে হবে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এ দেশের সরকার শুধু অর্থের অপচয় করেছেন। অন্য দেশে অনুরূপ একটি পরিকল্পনার যা ব্যয় হয় তা অপেক্ষা দশ গুণ বেশী টাকা খরচ করেছেন মাণ্ডি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার পিছনে"—Times of India পত্রিকায় এই উক্তিটির সমালোচনা করেছিল।[১২] দেশের

type? If neither of these two extremes is desired, the Planning Commission should lay down limits beyond which possibly uneconomic schemes will not go.…Economic realism is an essential element in economic planning." Times of India : Plan for Industry Oct. 8, 1924.

১২। "…Mr. Bose was somewhat wide of the mark in his accusation about money being 'squandered' by Governments of the Past on hydro-electric development and in his criticism of so-called 'foreign' concerns which have taken the initiative in putting India's natural resources to practical use." (Times of India, National Planning, Dec. 20, 1938)

অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যেমন Madras Mail, Amrita Bazar Patrika Pioneer, Modern Review এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রভৃতিতে জাতীয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের মতে জাতীয় পরিকল্পনা হবে সমাজতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল। তবে পরিকল্পনা যে সমাজতান্ত্রিক দেশেই কেবল হয়েছে তা নয়। সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন দেশেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে (যেমন জার্মানীতে হিটলারের আমলে হয়েছিল)। উত্তরপ্রদেশের সোনপুরে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য স্থাপিত প্রথম সোস্যালিষ্ট স্কুলের উদ্বোধন করে বলেন,

"সমাজতন্ত্র আধুনিক জীবনদর্শন-বিশেষ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার ফল স্বরূপ ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এখন চলছে চীনে ও স্পেনে।···

"সমাজতন্ত্রকে আমি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি। মঙ্গলজনক যখন বলছি, তখন এর নীতি আমি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে গেলে ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য জিনিসের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে। স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠন সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।"[১৩]

সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের

১৩। "Mr. Bose referred to world conditions and said that Socialism was a modern philosophy of life. The age of Individualism, with its resultant capitalism was over. At present, the struggle between capitalism and Socialism was going on in china and Spain···"I consider Socialism good for humanity, When I say, good, I accept the principle, but its applications in India depend on history and psychology of other factors. For free India, however, social reconstruction must be on the socialistic lines." (Amrita *Bazar Patrika, Nov. 22, 1938 ; Pioneer Nov. 22, 1938* )

শিল্পায়নের প্রতি সুভাষচন্দ্রের অনুরাগ গান্ধীজীর কাছে তো গ্রহণযোগ্য ছিলই না, দেশের ব্যবসায়ীমহলও তা পছন্দ করেনি। জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা এক্ষেত্রে স্পষ্ট ছিল না। তিনি বৃহৎ শিল্পের সম্প্রসারণের পক্ষে ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী-কে জওহরলাল নেহরুর লেখা চিঠির কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তাতে দেখা যায়, জওহরলাল নেহরুর মতে বৃহৎ যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ দিয়ে শিল্পায়নের দিকে ভারতের এগিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু এজন্য এদেশের ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। এটা ঠিকই, জওহরলালের এই চিন্তাধারা স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার পর সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার আগ্রহ জওহরলালের মধ্যে দেখা যায়নি। বরং তখন কংগ্রেসী আন্দোলন ও কংগ্রেসী প্রচার গুরুভার ও মূল শিল্পের সম্প্রসারণের বিরোধিতা-ই করেছে এবং জওহরলাল তার প্রতিবাদে সোচ্চার হননি। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সচিব পদ থেকে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথকে জওহরলাল অপসারিত করেছিলেন। কেন শ্রীকামাথ এই পথ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন তার আলোচনা এই প্রসঙ্গে আসছে না।[১৪] কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসকে কেন্দ্র

১৪। কামাথের অপরাধ ছিল, তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের গোঁড়া সমর্থক। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পরও কামাথ তাঁর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং এক্ষেত্রে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে সমালোচনাও করেছিলেন। নেহরু কামাথকে পরিকল্পনা কমিটির বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে গণ্য করে তাঁকে জানিয়েছিলেন, বিতর্কমূলক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ রাখা চলবে না। কামাথ প্রথমে ছিলেন পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারী ; নেহরু তাঁকে অপদস্থ করার জন্য তাঁর মাথার উপর অধ্যাপক কে. টি. শাহ্‌কে সেক্রেটারী-জেনারেল করেন এবং কামাথকে তিনজন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর অন্যতম করেছিলেন। কামাথ নেহেরুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, বিতর্কমূলক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারী

করে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ জওহরলাল নেহরুকে সুভাষচন্দ্র যে চিঠি লেখেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে সেটি একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে।[১৫]

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও সুভাষচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা থমকে দাঁড়ায়নি। সুভাষচন্দ্র তখন বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে ব্রতী হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁর ৩৮/২ এলগিন রোডস্থ বাসভবনে একটি ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছিলেন। বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ী সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে কিভাবে দেশের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটানো যায় এবং অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয় এবং স্থির হয় সর্বস্তর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি অদলীয় কমিটি গঠন করা হবে যার কাজ হবে কিভাবে দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা হবে তার উপায় নির্দেশ করা। এই বৈঠকের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালের ৮মে তারিখে সুভাষচন্দ্র National Economic Development Board নামে একটি দল-নিরপেক্ষ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই বোর্ডের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নতি বা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করাই তার উদ্দেশ্য, এবং তা ঘটতে পারে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির

হিসাবে তাঁর কার্যদক্ষতা কমিয়েছে নেহরু তা প্রমাণ করুন। কামাথ তারপর যুগ্ম সচিবের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র পাঠান এবং নেহেরু অবিলম্বে তা গ্রহণ করেন ; নেহরু তা-ই চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই তিনি পরিকল্পনা কমিটিতে রাখতে চাননি। এই প্রসঙ্গে কামাথ—নেহরু পত্রালাপ দ্রষ্টব্য। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" বইয়ে কামাথ-নেহরু পত্রালাপ উদ্ধৃত করেছেন।

মাধ্যমে। জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিষদ বা National Economic Development Board কৃষির উন্নয়নের জন্য যে-সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেগুলি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বোর্ড গুরুভার শিল্প ও মূল শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে আন্দোলন চালানোর কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এই বোর্ডের ঘোষিত নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানকালের ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের ( Industrial Development Bank of India ) অনুরূপ ছিল। বোর্ডের কর্মসূচীতেও বলা হয়েছিল,

জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বোর্ড একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে যার উদ্দেশ্য :

(এক) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ডিবেঞ্চার জমা রেখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান :

(দুই) স্বদেশে এবং বিদেশে ব্যবসা চালাবার জন্য অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য প্রদান করা :

(তিন) আংশিক বা পূর্ণ অর্থ সাহায্যের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় বিপণন প্রতিষ্ঠান ( Central Marketing Organisation ) স্থাপন, উত্তর ভারতে যার শাখা থাকবে ; এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে দেশ-বিদেশের বাজারে স্থানীয় শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করা।

সরকারের সহযোগিতা পাওয়া গেলে এই প্রতিষ্ঠান পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে পাটের সমগ্র উৎপাদন-বিপণনের ভার গ্রহণ করতে পারে ;

( চার ) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক অর্থ সাহায্যের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় শিল্পসমিতি স্থাপন, যার শাখা থাকবে গ্রামে ও শহরে উভয়ত। এই প্রতিষ্ঠান হবে একটি ব্যাংক বা ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট জাতীয় একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে আরও কয়েকটি জিনিস ছিল। যেমন, (১) শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে সরবরাহ করা যায়

সেজন্য একটি ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই ব্যুরোর কাজ হবে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ করা, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরাচরিত পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত—যুবকদের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৩) অধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে ব্যবসা বণ্টনের জন্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই বোর্ড আলোচনা চালাবে।

দেশের শিল্পায়নের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। শিল্পায়নের ফলে দেশে বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের শিল্পগুলির সম্প্রসারণ হলে, এবং বিশেষ করে গুরুভার ও মূল শিল্পগুলি উন্নত হলে শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়বে সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল, উৎপাদিত শিল্প-সামগ্রী এমনও হতে পারে যেগুলি দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেও দেশের ভিতরেই ব্যবহৃত হবে; অথবা কিছু পরিমাণ সামগ্রী দেশের বাইরে রপ্তানি করা হবে। আবার এমন শিল্পসামগ্রী উৎপাদিত হতে পারে যেগুলি আগে বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ইংলণ্ড থেকে, আমদানি করতে হত এবং যেগুলিকে বলা যেতে পারে আমদানির বিকল্প সমগ্রী (import substitutes)। কিন্তু আমদানির বিকল্প সামগ্রীর উৎপাদনই হোক, আর রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনই হোক, উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান (inputs), বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন হয়। পরাধীন ভারতে ইংরেজ সরকারই বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভারতীয়দের তাতে কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিলনা।

১৯৩৩ সালের ১০ই জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত ব্রিটেনের কাছে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ, এবং ভারত হল ব্রিটিশ শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার, অন্যদিকে ভারত শিল্প-উৎপাদনকারী একটি দেশ হতে চায়। এইভাবে সে শিল্প-সামগ্রীর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, তার ফলে ভারত শুধু কাঁচা মাল নয় শিল্পজাত পণ্যও রপ্তানি করতে পারে। বর্তমানে ভারত ব্রিটেনের বৃহত্তম বাজারগুলির অন্যতম।

তাই ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী।"[১৭] তারও আগে ১৯২৮ সালের ৩রা মে পুনরায় ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সামগ্রী বয়কট ও স্বদেশী জিনিসের প্রচার প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমরা বহির্বিশ্ব থেকে ২৩১ কোটি টাকার জিনিস বছরে আমদানি করে থাকি এবং তার মধ্যে ১১১ কোটি টাকার জিনিসই যুক্তরাজ্য থেকে আসে।··· ১১১ কোটি টাকার ব্রিটিশ সামগ্রী আমদানির মধ্যে ৪৯ কোটি টাকার সুতী বস্ত্র এসে থাকে।"[১৮] ইংরেজ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে ভারতের সুতীবস্ত্র শিল্প তখন শোচনীয় অবস্থায় ছিল। তাছাড়া ব্রিটেন থেকে তখন রাসায়নিক সামগ্রীর কলকব্জা, লোহা-ইস্পাত, সাবান, তামাক, রেলওয়ে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা হত। ত্রিশের দশকে অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর সংরক্ষণ দাবি করা ছাড়া ভারতীয়দের আর কিছুই করার ছিল না।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের পর প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি গঠিত হবার পর অবস্থার পরিবর্তন করানোর জন্য সুভাষচন্দ্র খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মতে আমদানি-রপ্তানির জন্য ভারতের উচিত ছিল ইংলণ্ডের উপর নির্ভর না করে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করা।

১৯৩৫ সালের ২৭শে নভেম্বর সুভাষচন্দ্র ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের কাছে যে বক্তব্য প্রেরণ করেছিলেন এক্ষেত্রে তার উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৯]

"ভারত-জার্মাণ বাণিজ্যের পরিসংখ্যান সম্বন্ধে 'Bombay Chronicle' পত্রিকায় গত ১৬ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত বোম্বাইয়ের

---

১৭। সুভাষ রচনাবলী ( জয়শ্রী প্রকাশন ) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৬

১৮। ঐ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫৮।

১৯। সুভাষ রচনাবলী ( জয়শ্রী প্রকাশন ), তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১

ভারতীয় বণিক সভার সম্পাদক ও ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে পত্রবিনিময় আমি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম। স্মরণ করা যেতে পারে যে কয়েকমাস আগে আমি যখন কালর্সবাদে ছিলাম তখন জার্মানীর সঙ্গে ভারতের যে প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা বর্তমান তার প্রতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতিতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তাছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বর্তমানে জার্মান কারখানাগুলিতে শিক্ষানবিশের সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। এই দুটি অসুবিধার জন্য ভারত সরকার প্রধানত দায়ী হলেও ভারতীয় বণিক সভার উপরও কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়ে। ইউরোপে এখন সাধারণ পদ্ধতি হল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি করা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নীতি অনুসরণ করা। ভারতেও এই নীতি অনুসৃত হবে না কেন ?···আমি ভারতের বহির্বাণিজ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নীতি গ্রহণ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। এই নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি প্রয়োজন। অধিকন্তু আমার অভিমত এই যে তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ যেমন জার্মানীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের আগে চুক্তি করে নেয় যে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অধিবাসীকে জার্মান কারখানাগুলিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে, তেমনই ভারত সরকারেরও উচিত অনুরূপ শর্ত আরোপ করা। আমি ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে বলতে পারি যে এরূপ শর্ত আরোপ করা হলে জার্মানী তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। অবশ্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা হবে ভারত সরকার কর্তৃক এই শর্ত আরোপ করা। কিন্তু তারা যদি তা না করেন তাহলে ভারতীয় বণিক সভা কাজে নামতে পারেন। যদি বেসরকারী সংস্থাগুলি ভারতীয় বণিক সভার মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে এই দাবি করে, তাহলে সে দাবি নিশ্চয়ই মঞ্জুর করা হবে। আমার খবর আছে যে গত বছর ভারত সরকার কর্তৃক জার্মান সংস্থাগুলির কাছে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা মূল্যের জিনিস সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। বৃহত্তর অংশ পেয়েছিল ক্রুপ্‌স্ (Krupps)। আমরা পরিবর্তে কী পাচ্ছি তা কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

"এইসঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যে-সব বৈদ্যুতিক ও ইস্পাত দ্রব্যের ( যন্ত্রপাতিসহ ) জন্য জার্মানী প্রসিদ্ধ তার অনেকগুলিতে চেকোশ্লোভাকিয়াও বিশেষজ্ঞ। চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উদ্বিগ্ন এবং বহুবছর ধরে যে ভারতের কাছে যত মূল্যের জিনিস বিক্রি করে তার চেয়ে বেশি মূল্যের জিনিস ভারত থেকে কিনে চলেছে। তাছাড়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডার মতো নামকরা কারখানাগুলিতে ভারতীয় শিক্ষানবিশদের স্বাগত জানানো হয়। এ অবস্থায় ভারতের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে আমরা যদি জার্মানী থেকে জিনিস সরবরাহের কিছু অর্ডার চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তান্তর করি তাহলে আমরা যে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করব তা-ই নয়—তার ফলে জার্মানী ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও প্রত্যাশার প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে বাধ্য হবে।

"ভারত থেকে ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে হ্যামবুর্গের মতে জার্মান বন্দরগুলি শুধু জার্মানীর জন্য প্রেরিত জিনিসই গ্রহণ করে না, অন্যান্য মধ্য ইউরোপীয় দেশের জন্য প্রেরিত জিনিসও গ্রহণ করে। জার্মানীতে প্রস্তুত পরিসংখ্যান-বিষয়ক বিবরণ ত্রুটিযুক্ত, কেননা জার্মান বন্দরগুলিতে যে-সব ভারতীয় জিনিস যায় সেগুলি থেকে তাদের সঠিক গন্তব্যস্থল জানা যায় না। উপসংহারে আমি পুনরায় আদান-প্রদানের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রশ্নটি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ভারতবাসীর কাছে আবেদন জানাই।"

সুভাষচন্দ্রের উক্ত বিবৃতি থেকে বোঝা যায় ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হবেই ; এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকার দরকার। আধুনিক ভারতে আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি দেখতে পাই। সুভাষচন্দ্র এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ত্রিশের দশকে। ১৯৩৫ সালের

ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সুভাষচন্দ্র তা অনুধাবন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ভারত শাসন আইন ভারতীয় আইন-সভার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করেছিল। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন …"অতীতে ভারতের যে-সব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, যেমন জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—সেই-সব দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি হওয়া উচিত।—এটা আমার নিশ্চিত অভিমত। কিন্তু নূতন সংবিধান অনুসারে এইরূপে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বাধ্য করার মতো কোনো ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার থাকবে না। আইনে যে-সব অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবসায়িক রক্ষাকবচ আছে, সেগুলির ফলে ভারতের জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন অসম্ভব হয়ে উঠবে—এটা বিশেষ করে সত্য হবে সেই সব ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে, যেগুলি ব্রিটিশ ব্যবসায়িক কিংবা শিল্পগত স্বার্থের বিরোধিতা করতে পারে কিংবা করে।"

ভারতের জন্য একটি সক্রিয় বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "ব্রিটিশ শিল্পের অব্যবহিত কিংবা সাময়িক কিছু উপকার করার উদ্দেশ্যে প্রায়ই যেরূপ করা হয় সেইরূপে গোঁজামিলের পদ্ধতিতে কিংবা খণ্ডিতভাবে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যকে না দেখে তাকে ব্যাপক পদ্ধতিতে দেখা উচিত যাতে একদিকে তার রপ্তানি বাণিজ্য ( export trade ) এবং অপর দিকে তার বৈদেশিক দায়ের ( foreign liabilities ) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতি এমন যে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার কোনো বিধিনিষেধমূলক চুক্তি থাকবেনা। এই-সব বিধিনিষেধ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত যে সব দেশ কয়েকটি বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠ ক্রেতা তাদের সঙ্গে ব্যবসা ব্যাহত করে কিংবা অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের দরকষাকষির শক্তি হ্রাস করে। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারত-ব্রিটেন

বাণিজ্য-চুক্তির দীর্ঘায়ত আলোচনা এখনও চলছে আর সেই সঙ্গে অটোয়া চুক্তির ( Ottawa Pact ) বিজ্ঞপ্তিকাল অবসানের পর এবং এই চুক্তির অবসান ঘটানোর জন্য আইন-সভার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এটা এখনো চালু আছে এবং ব্রিটিশ ইস্পাত ও কাপড়ের উপর ভিন্ন ধরনের শুল্ক সহ উক্ত অটোয়া-চুক্তি ব্রিটিশ শিল্পগুলির জন্য বর্তমান সুযোগ সংগ্রহ করে দিয়েছে :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার যে শিল্পসংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তার প্রচণ্ড সমালোচক ছিলেন। প্রভেদ-মূলক সংরক্ষণনীতি ( Policy of Discriminating Protection ) যে ইংরেজদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্র দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন তাতে দেশের কারিগরদের বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির ব্যবস্থা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুভাষচন্দ্র যেভাবে দেশের দ্রুত শিল্পায়নের কথা বলেছেন তাতে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের গুরুত্ব আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সুভাষচন্দ্র জাতিকে দিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংকল্প। গান্ধীজী প্রভাবিত রাজনৈতিক মঞ্চে চারদিক থেকে গান্ধীবাদী নেতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়েও সুভাষচন্দ্র তাঁর আদর্শ থেকে একচুলও নড়েননি। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন দ্রুত শিল্পায়ন। আধুনিক পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আজ এটা স্বীকৃত যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগোতে পারেনা। ভারতের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রই এই পথের প্রথম দিশারী।

## শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র

ত্রিশের দশকের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশের একজন প্রথম সারির শ্রমিক নেতা। ১৯২৯ সালের শেষেই সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যেও আমরা তার অর্থনৈতিক চিন্তার একটি ছাপ পাই। ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর সুভাষচন্দ্র "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অফ ইণ্ডিয়া"-র বাংলা শাখার যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাতে বলা হয়েছিল, "...শিল্পের পরিচালনা, কর্মচারী নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের বিষয়ে শ্রমিকদের মতামতের স্থান থাকবে। শিল্পে মুনাফার অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিক, মালিক ও পরিচালকদের মধ্যে সকল বিবাদই নিরপেক্ষ সালিশী বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে; তার উদ্দেশ্য হবে ধর্মঘট ও লক আউট যেন অনাবশ্যক হয়ে যায়।...কারখানার শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টার কর্মদিবস করা হবে। রাষ্ট্র বেকার ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা দেবে। শ্রমিকদের সুবিধার জন্য এইসব ব্যবস্থা করা হবে: (ক) অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার জন্য বীমা, (খ) প্রসূতি-কল্যাণ ব্যবস্থা (গ) শিশুদের জন্য ক্রেশে, (ঘ) শ্রমিকদের বাসগৃহ, (ঙ) পর্যাপ্ত ছুটি ইত্যাদি।"[১]

সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যে কর্মসূচীর কথা উপরোক্ত ইস্তাহারে বলেছিলেন, তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের আগে শ্রমিকদের অদক্ষতা খুবই বেশি ছিল। এই অদক্ষতার কারণ ছিল,—তাদের শিক্ষার অভাব, উপযুক্ত বাস গৃহের অভাব, কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রের শ্রমিক-কল্যাণ কর্মসূচী অনুযায়ী দেখা যায় আধুনিক শ্রম-অর্থনীতিতে (Labour Economics) শ্রমিকদের সামাজিক

১। সুভাষ রচনাবলী—(জয়শ্রী প্রকাশন) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫

নিরাপত্তার জন্য যা যা ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে, সেগুলি সবই উক্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু তা-ই নয়, আধুনিককালে শিল্প-বিরোধের কারণগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে তার অধিকাংশ কারণই হল শ্রমিকদের দিক থেকে নিরাপত্তা অভাবের আশঙ্কা। "শিল্প বিরোধ" বলতে বোঝায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং সংঘাত। শিল্প বিরোধের পরিণতি হিসাবেই দেখা যায় কারখানার লক-আউট, শ্রমিক ছাঁটাই অথবা শ্রমিক ধর্মঘট। শিল্প-বিরোধের কারণগুলি যে সর্বদাই অর্থনৈতিক হবে তা নয়। আর্থিক কারণে যে শিল্প-বিরোধের সৃষ্টি হয়, শ্রমিকদের কার্যক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বেশি। (১) কাজের শর্ত ও কাজের সময়; (২) বাসস্থানের অব্যবস্থা; (৩) শ্রমিকদের মতামত উপেক্ষা করে মজুরি-হার পরিবর্তন; বোনাস বা মাগ্‌গীভাতা সংক্রান্ত মতভেদ; (৪) শ্রমিক ছাঁটাই; (৫) শ্রম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অভাব; (৬) কাজে নিরাপত্তার অভাব; (৭) চাকরির স্থায়িত্বের অভাব; এবং (৮) সর্বোপরি দ্রুত দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট ও ক্ষেত্রবিশেষে শ্রমিকদের দ্বারা মালিক ঘেরাও—প্রভৃতি-ই বর্তমানকালের শিল্প-বিরোধের কারণ। শ্রমিক-নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য যে-সব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিল্প-বিরোধের মূল কারণগুলি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন,—কিন্তু অযথা শ্রমিক-ধর্মঘটের তিনি সমর্থক ছিলেন না। জামশেদপুরে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর ধর্মঘট এবং লক আউট প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ১৯২৮ সালের ৩রা নভেম্বর যে বিবৃতি দেন সেটা এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র শ্রমিক অ্যাসো-সিয়েশনের সভাপতিরূপে জামসেদপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং লক-আউট তুলে নেওয়ার জন্য ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আলেকজান্দারকে প্রায় রাজী করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু একটি পাল্টা শ্রমিক সংগঠনের নেতা শ্রীহোমির আচরণের দরুন শেষপর্যন্ত সেই বোঝাপড়া ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, সুভাষচন্দ্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে চুক্তি

করেছিলেন, শ্রীহোমি তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর স্বার্থে সেটা মেনে নিতে চাননি এবং দলে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্র তখন যে বিবৃতি দেন তার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল।

"আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, শ্রমিকদের আবার ধর্মঘট করবার জন্য উস্কানি দেওয়াই শ্রীহোমির উদ্দেশ্য। তার ফলে কোম্পানির নিঃসন্দেহে ক্ষতি হবে। প্রত্যেকেই জানেন যে কোম্পানি যদি আবার লোকসানের ধাক্কায় পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের হাত থেকে এটা চলে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোম্পানির ক্ষতি করার জন্যই শ্রমিকদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা উচিত কিনা। শিল্পকেন্দ্ররূপে জামশেদপুরের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এটা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র রূপ। সকল প্রদেশ থেকেই এখানে লোক এসে জড়ো হয়। প্রত্যেক শ্রমিক-হিতাকাঙ্ক্ষীর উচিত জামশেদপুরে একটি আদর্শ শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা। কোম্পানি শ্রমিক সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, উপরন্তু মাইনের দিন শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করছে। কোম্পানি এইভাবে শ্রমিকদের সাহায্য করছে, নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের অমীমাংসিত কিছু অভিযোগ আছে। কিন্তু শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন থাকলেই ঐ-সব অভিযোগ দূর করা যাবে। শ্রমিকদের ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে শ্রীহোমি শ্রমিকদেরও কল্যাণ করছেন না, পুঁজির মালিকদেরও উপকার করেছেন। যদি একজন ব্যক্তির খেয়ালখুশি ও মুদ্রাদোষের দরুণ জনসাধারণের স্বার্থের হানি ঘটাতে আমরা দিই তবে ভারতের সত্যই দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। জামশেদপুরের শ্রমিকদের বাঁচাতে হবে। তাদের বাঁচাতে হলে সেখানকার ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।"[২]

এই বিবৃতি দেওয়ার আগে ১৯২৮ সালের ২৭শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রের বিবৃতিতে বলেন,[৩]

২। সুভাষ রচনাবলী—ঐ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮,

৩। ঐ, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭০

"আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই যুক্তিপরায়ণ। শ্রীযোশী প্রাণপণে চেষ্টা করেও তাঁর প্রভাব বজায় রাখতে পারছেন না। একথার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকদের কোনো অভিযোগ নেই। মে মাসের হরতালের আগে তাদের সত্যই বহু অভিযোগ ছিল। তার কিছু কিছু এতদিনে দূর হয়েছে; কিন্তু বহু অভিযোগ এখনও দূর হয়নি। শ্রমিকরা ঐ-সব অভিযোগ দূর করার পূর্ণ সুযোগ কর্তৃপক্ষকে দেবে। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের করণীয় না করেন তাহলে আবার গোলযোগ দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির সঙ্গে আমাকে প্রকাশ্যে লড়াইয়ে নামতে হবে, অথবা শ্রমিক সমিতির সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক ছেদ করব।

কর্তৃপক্ষের সামনে এখন মূল সমস্যা হল সমহারে বোনাস বণ্টন ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, জল ও আলোসহ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, অফিসাররা যেন শ্রমিকদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। চতুর্থত, স্বেচ্ছামতো শাস্তি দান ও এককথায় ছাঁটাই বন্ধ করা। পঞ্চমত, অবসর নেবার সময় বৃদ্ধ কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান। ষষ্ঠত, ছুটি ও চাকরি সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন। সর্বশেষে, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে যারা কাজ করে তাদের অভিযোগ দূর করা।"

দেখা যাচ্ছে, সুভাষচন্দ্র শ্রমিক-নেতা হিসাবে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন কিন্তু প্রথমেই ধর্মঘটের পথে গিয়ে তিনি শিল্পে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে আগ্রহী ছিলেননা। কারণ, তাতে শুধু যে শ্রমিকদেরই স্বার্থহানি হয় তা নয়, দেশেরও শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। জামসেদপুরের ইস্পাত শিল্পকে সুভাষচন্দ্র জাতীয়শিল্প হিসাবে মনে করতেন,—সেজন্য সংঘাতের পথে না যেয়ে আলোচনা ও সালিশীর মাধ্যমে শ্রমিকদের সব দাবি-দাওয়া পূরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মঘট হওয়া উচিত শ্রমিকদের শেষ হাতিয়ার। তার আগে দরকষাকষি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজেদের দাবি মেটানোর চেষ্টা চলা উচিত; তাতে শিল্প ও শ্রমিক উভয়েরই লাভ,—এই যুক্তিতে সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, বেকার

ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, শ্রমিকদের বাসস্থানের সুবিধা, শিক্ষার সুযোগ, ন্যায়সঙ্গত মজুরি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা এই দাবিগুলি আদায়ের জন্য সুভাষচন্দ্রের মতো সমকালীন অন্য কোনো নেতা এতটা সোচ্চার হননি।

১৯২৮ সালে ১০ এপ্রিল খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকদের প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রের সব শক্তি মালিকের সমর্থনে নিয়োজিত হয়; আর স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের কাজে মালিকশ্রেণী সরকারকে সাহায্য করে। অদূর ভবিষ্যতে শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনেও শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেবে। শ্রমিকরা পদের যথাসাধ্য না করলে শুধু শিল্পের অগ্রগতি নয়, দেশের সমৃদ্ধিও আসবেন না। কিন্তু তার জন্য শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সাধারণ শত্রুর বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বিসম্বাদ দূর করতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিসম্বাদ আছে। কিন্তু আপনাদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে হবে। আপনাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একযোগে কাজ করতে হবে।"[৩]

১৯২৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে লিলুয়ার রেল শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ২ শে এপ্রিল সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন,[৪] "লিলুয়ার শ্রমিকরা ৪২ দিন যাবৎ মানুষের মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষ এখনো শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা দেখাননি। শ্রমিকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করার উদ্দেশ্যে ঐ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ইচ্ছাও তাঁরা প্রকাশ করেন নি। উপরন্তু তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে খরচ কমানো ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ২৬০০ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হবে। বামুনগাছির মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ও রেল কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষ কোন মীমাংসাই চান না। শ্রমিকদের এই সংগ্রামে হয় জয়লাভ করতে হবে অথবা বিনাশর্তে তাদের কাজে ফিরে যেতে হবে। শেষোক্ত

৩। ঐ পৃষ্ঠা ১২৪

৪। ঐ পৃষ্ঠা ১২৫

পথটি কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু প্রথমোক্ত পথটি কিছুতেই সম্ভব নয় যদি না জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যায়। আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন সংকটগ্রস্ত শ্রমিকদের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসেন। রাষ্ট্রের সকল শক্তির সাহায্য পুঁজির পেছনে রয়েছে। তারই বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সংগ্রাম করছে, সে সংগ্রামে শ্রমিকদের জন্য প্রত্যেকেরই কিছু করণীয় আছে।" শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ছিল আপসহীন। ১৯২২ সালের মে মাসে লিলুয়ায় লক আউট হলে সুভাষচন্দ্র তার বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠেন। তিনি তখন পূর্ব ভারতীয় রেলে সহানুভূতি সূচক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন যাতে পূর্বভারতীয় রেল ও রেলওয়ে বোর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে জামশেদপুর টিনপ্লেট কারখানার ধর্মঘট এবং আগষ্ট মাসে বর্মা অয়েল কোম্পানির শ্রমিকবিরোধী একগুঁয়ে মনোভাবের বিরুদ্ধেও সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। শ্রমিকরা যে শুধু আন্দোলন-ই করবে তা নয়, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের একটি বিশেষ অবদান থাকবে এবং সেই অবদানের পেছনে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া সব পূরণ হবে সুভাষচন্দ্র একথা বিশ্বাস করতেন। শ্রমিকদের মজুরি, বাসস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু থাকা উচিত যাতে তাদের কাজে পারদর্শিতা থাকে ও তাদের উৎপাদনী শক্তি বাড়ে। সুভাষচন্দ্র এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে শ্রমিকদের যে ভাবে শোষণ করা হত তাতে শ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তি বেড়ে যাবার প্রশ্ন তো ছিলইনা,—বরং তাদের বেঁচে থাকার সমস্যাটাই ছিল জরুরী। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এই দুর্যোগময় অবস্থায় শ্রমিকরা পেয়েছিল সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ১৯২৯ সালের ২৭ শে অক্টোবর বজবজে শ্রমিক সভায় সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "গত দুই মাস যাবৎ তৈল ও পেট্রোল কোম্পানির ছয় হাজার শ্রমিক সাহসের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে,

কিন্তু দালালরা চারদিকে ঘোরাফেরা করছে, সে বিষয় সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। নানা স্বার্থসম্পন্ন মহল বিষাক্ত প্রচার চালাছে। সে সম্পর্কেও আপনারা হুশিয়ার থাকবেন। বর্তমানে যে ধর্মঘট চলছে সেজন্য দায়ী কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের আপসহীন উদ্ধত মনোভাব। আমি তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে যদি তাঁরা কারখানা চালাতে ও মুনাফা অর্জন করতে চান তবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তা করা সম্ভব হবে না। তাঁরা যে চেষ্টা করলেও সফল হবেন না। দেশের পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেছে। যে মালিক যত সম্পন্নই হোন-না-কেন এরকম আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চলতে পারবেন না, শ্রমিকদের ইউনিয়নকে তাঁদের স্বীকৃতি দিতেই হবে, শ্রমিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে, নতুবা শোষকদের বিরুদ্ধে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে এদেশে তাঁদের পক্ষে আর বেশিদিন ব্যবসা চালানো সম্ভব হবে না। বিদেশীরা যদি এখানে বন্ধুর মতো থাকেন তবে তাদের আপত্তি হবে না, তবে তাঁদের শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের মানবিক আচরণ করতে হবে ও তারা যে বিরাট মুনাফা লুটেন তার যথেষ্ট পরিমাণ ভাগ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা তাঁদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেন তবে ঠিক ঐরূপ আচরণ ফেরৎ পাবার জন্য তাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে।"[৫] ধর্মঘটী শ্রমিকদের উদ্দেশ্য সুভাষচন্দ্র সেই ভাষণে আরও বলেন, পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক নয়, আগে বর্মা অয়েল কোম্পানিই ছিল এক্ষেত্রে একমাত্র কোম্পানি। তারপর নিউ ইয়র্কের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, এশিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ও ইন্দো-বর্মা কোম্পানি তাদের কারখানা খুলেছে। এখন আরো কিছু প্রভাবশালী কোম্পানি এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। যদি ধর্মঘট চলে তবে পূর্বতন কোম্পানিগুলির সাংঘাতিক লোকসান হবে ও ইতিমধ্যে নূতন কোম্পানি সহজে বাজার দখল করতে পারবে। যে মুহূর্তে কোম্পানিরা বুঝতে পারবে যে তাদের শ্রমিকরা আবশ্যক হলে মাসের পর মাস ধর্মঘট চালিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে তখনই তারা আর ধুরন্ধর দালালদের কথায় চলা ছাড়বে ও শ্রমিকদের দাবি আর নস্যাৎ করে দেবেনা। আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি

৫। সুভাষ রচনাবলী, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪৮-২৪৯

এখনই কাজে যোগ দিতে চান? সকলেই হাত তুলে সমস্বরে জানায়: না)। আমি কোম্পানিদের, বিশেষ করে বার্মা শেল কোম্পানিকে সাবধান করে দিচ্ছি যেন তারা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি-প্রসূত নীতি ছেড়ে দেয়। পুলিশ যেভাবে শ্রমিক-আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করছে সে সম্পর্কেও আমি পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।…শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আমাদের বৈধ অধিকার এবং এই অধিকারে হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করব না। সে ক্ষেত্রে আমি নিজে কারখানার ফটকে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করব ও তাতে যাই ঘটুক আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি শ্রমিক বন্ধুদেরও বলছি, আপনারা জেলে যেতে ভীত হবেন না। আপনারা সব রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমি এখনো আশা রাখি যে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। সরকার যদি সত্যই এ বিরোধ মেটাতে চান তবে শ্রমবিরোধ আইন অনুসারে তাঁরা ব্যবস্থা নিতে পারেন।"[৬]
টিনপ্লেট কারখানার ধর্মঘট এবং অয়েল কোম্পানির শ্রম-বিরোধী মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করে সুভাষচন্দ্র আইনসভার সদস্যদের কাছে আবেদন করেছিলেন এই কোম্পানির উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। সুভাষচন্দ্রের মতে "আইনসভার সদস্যরা চাইলে, তাঁদের হাতে যে সকল উপায় আছে তারই সাহায্যে বর্মা অয়েল কোম্পানির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রথমত, ভারতীয় পণ্য ক্রেতার মূল্যে টিনপ্লেট কোম্পানি (বর্মা অয়েল কোম্পানিই টিনপ্লেট কোম্পানির প্রকৃত মালিক) সংরক্ষণ-এর সুবিধা ভোগ করছে—কেননা সকল আমদানিকৃত টিনপ্লেটের উপর সংরক্ষণ শুল্ক চাপানো হয়েছে। ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে যে ওয়েলস প্লেট ও সীট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এই শুল্ক আরোপ করার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। তার ফলে আমরা দেখছি, একটি বিদেশী কোম্পানি—ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র যার সহানুভূতি নেই, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—ভারতীয় পণ্য ক্রেতাদের মূল্যে তারা সংরক্ষণের সুবিধা

৬। ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০

ভোগ করছে। আরো একটি বিষয়ে বর্মা অয়েল কোম্পানির মতো একটি বিদেশী কোম্পানি ভারতীয় পণ্যক্রেতাদের মূল্যে প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করছে। কেরোসিন ও আরো কয়েকটি খনিজ তেলের ক্ষেত্রে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেল ও অপরাপর আমদানিকৃত তেলের উপর ধার্য শুল্কের ব্যাপারে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে। বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের উপর গ্যালন প্রতি একআনা শুল্ক ধার্য করা আছে। কিন্তু অন্য আমদানিকৃত তেলে গ্যালন প্রতি আড়াই আনা ধার্য হয়েছে। এই সুস্পষ্ট বৈষম্যের দরুণ বর্মা অয়েল কোম্পানি বিপুল মুনাফা লুটছে ও ভারতীয় ক্রেতাদের তার জন্য চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। বর্মা অয়েল কোম্পানি একটি বিদেশী সংস্থা। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি তার মনোভাবও যখন অমানবিক তখন তার স্বার্থে ভারতের জনগণের উপর এ-হেন পরোক্ষ কর চাপানো আইনসভার পক্ষে আর কোনো যুক্তি নেই। ভারতের শ্রমিক ও বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষ থেকে আইনসভার সদস্যদের কাছে আমার আবেদন, আমদানিকৃত টিনপ্লেটের উপর শুল্ক তুলে নিতে ও বর্তমানে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেল ও আমদানিকৃত তেলের উপর ধার্য শুল্কের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা দূর করতে আইনসভার সদস্যরা যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"[৭]

গোলমুড়িতে টিনপ্লেট কোম্পানির অচলাবস্থা সৃষ্টির পর সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ-ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ সালের ২৮শে আগষ্ট জামশেদপুরে বলেন, "টিনপ্লেট কোম্পানি ভয় দেখাচ্ছে যে সংরক্ষণ প্রত্যাহৃত হলে তারা চিরতরে কোম্পানি বন্ধ করে দেবে। তখন বর্মা অয়েল কোম্পানি বিদেশ থেকে টিনপ্লেট আমদানি করবে। যদি তারা তাই করে তবে এখনকার লড়াই বর্মা অয়েল কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে পরিণতি লাভ করবে।…ভারতে বর্মা অয়েল কোম্পানির যেখানে যত কারখানা আছে সর্বত্র আমরা গোলমুড়ি শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলন করার আবেদন জানাব। বর্মা অয়েল কোম্পানির তেল ও আমদানিকৃত

৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮

তেলের উপর ধার্য শুল্কে যে তারতম্য আছে তা দূর করার জন্য ও আইন-সভায় আমরা ব্যবস্থা নেব।"[৮]

সুভাষচন্দ্র রেল শ্রমিকদের আন্দোলনে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার দুটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে যেমন তিনি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী হতে আহ্বান জানিয়েছেন, অপরদিকে তিনি তেমনি ঘন ঘন ধর্মঘট ডাকার যে বিপদ সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯২৯ সালের ১৬ই আগষ্ট লিলুয়া ময়দানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল ইউনিয়নের (E. I. R.) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সমাবেশে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "রেল বোর্ডে একজনও ভারতীয় সদস্য নেই।...রেল থেকে অর্জিত মুনাফা প্রতিদিন বাড়ছে। অথচ গরীব শ্রমিকদের প্রতি পদে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। রেলের বিদেশী প্রশাসকরা যতক্ষণ মুনাফায় ঘাটতি না পড়ে ততক্ষণ কোনোদিকে তাকিয়ে দেখেনা—এমনই হৃদয়হীন। তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের অভিযোগে তারা কর্ণপাত করে না। আপনারা অভিযোগ করেছেন যে ছুটি সম্পর্কিত অন্যায় চিঠি আপনাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্বরাজ লাভ করলে তবেই আপনাদের অভিযোগগুলির মীমাংসা হতে পারবে। তাই স্বরাজের জন্য সংগ্রাম ও আপনাদের আন্দোলন একই সঙ্গে চালাতে হবে।...শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ওয়েলফেয়ার কমিটি গড়ে তোলা হচ্ছে। তার ফাঁদে আপনারা পা দেবেন না। এই ওয়েলফেয়ার কমিটিগুলি মধুর নামের আড়ালে আসলে সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র। শ্রমিকদের দিক থেকে দেখলে এগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর সংগঠন। এগুলি বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী সংগঠন। তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। ঐগুলি থেকে আপনারা সর্বদাই দূরে থাকবেন। ..রেল ইউনিয়নই আপনাদের একমাত্র আশাস্থল। ...আপনাদের ইউনিয়নকে এভাবে

৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯

শক্তিশালী করতে হবে: (১) একটি শক্তিশালী কার্য-নির্বাহক কমিটি গঠন ; (২) নির্ভরযোগ্য রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন ; (৩) আপনাদের ইউনিয়নকে স্বীকার করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা। ই. আই. রেল কর্তৃপক্ষ আপনাদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করছেন কেন আমি তা-ই বুঝতে পারি না। সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাশ করেছেন। এই আইনের বিধান এই যে এইসব ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ই. আই. রেল এই একই সরকারের মালিকানাধীন। আপনারা তাই ইউনিয়নের স্বীকৃতি আপনাদের অধিকার বলে দাবি করতে পারেন।

"এই সূত্রে শ্রমবিরোধ আইনের ( Trade Disputes Act ) কথা উল্লেখ করি। ঐ আইনে সালিসী বোর্ড গঠনের কথা আছে, শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে এই বোর্ড গঠন করতে সরকার বাধ্য। গোলমুড়িতে টিনপ্লেট শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। কিন্তু সরকার এরকম কোনো বোর্ড গঠন করেননি। এই সব ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সরকার পুঁজিপতিদের দিকে ঝুঁকে আছেন, শ্রমিকদের প্রতি যার সহানুভূতি নেই। তাই আপনাদের ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আপনারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। আপনারা ব্যবস্থাপক সভায় ও রেলবোর্ডে এ প্রশ্ন তুলবেন। প্রচার বাড়িয়ে চলুন। লক্ষ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত থামবেন না। তবেই প্রত্যয়ের সঙ্গে আপনারা ইউনিয়নের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। আমিও দেখতে চাই যে যে ক্ষেত্রেও সরকার অপনাদের দাবি উপেক্ষা করেন কিনা।" [৯]

সুভাষচন্দ্র, বিশ্বাস করতেন যে ঘন ঘন ধর্মঘট করা উচিত নয়, "গুরুতর শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পন্থা রূপেই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গেছে, পর্যাপ্ত তহবিল ও ভালো সংগঠন না থাকার ফলে বহু ধর্মঘট ভেঙ্গে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট রসদ না থাকলে ধর্মঘট আহ্বান করা অসঙ্গত। পুঁজিপতিরা যদি জানতে পারে যে ধর্মঘটীদের জমা তহবিল বিশেষ নেই, তাদের নতিস্বীকার করানো

---

৯। ঐ পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮০

যাবে, তাহলে তারা অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করবে। গত বছরের লিলুয়া ধর্মঘট তার দৃষ্টান্ত। তহবিল ছিল না ও জনসাধারণের সমর্থন পায়নি বলে এই ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। তাই আপনাদের প্রথম কর্তব্য ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করা ও স্থায়ী ভিত্তির উপর তাকে গড়ে তোলা। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন তবে ধর্মঘট করার হয়তো প্রয়োজন হবেনা; ধর্মঘটের হুমকিতেই আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারবে। ইংলণ্ডে ইস্পাত শিল্পের ইউনিয়ন খুব শক্তিশালী। সেখানকার শ্রমিকদের কখনো ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয়নি। তারা এত শক্তিশালী যে পুঁজিপতিরা তিক্ততা সৃষ্টি না করেই তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেছে।"[১০]

কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিলের শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্রের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী আমরা দেখতে পাই। আন্দোলনের স্বার্থে আন্দোলন এবং সর্বক্ষেত্রে মালিকদের বিরোধিতা করা এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে মোহিনী মিলে যখন শ্রমিকরা তিনটি শিফটে কাজের দাবি করেছিলেন তখন সুভাষচন্দ্র মিল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছিলেন যে, "আমি অনুভব করি যে বর্তমান অবস্থায় তৃতীয় শিফ্‌টের কাজ চালানো যেতে পারে না—এই অবস্থা আমাদের মেনে নিতে হয় এবং চালু দুইটি শিফটকে তিনটি শিফটে বিভক্ত করাও সঠিক হবে না। এই বিরোধ জিইয়ে রেখে এবং দুই শিফটে কাজ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালু রেখে শ্রমিকদের কিংবা তাঁদের কোনো অংশের কোনো মঙ্গল হতে পারেনা। কোম্পানি যদি অসঙ্গত মনোভাব দেখায় তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকব—এই মর্মে আমি ইতিপূর্বেই প্রকাশ্য ঘোষণা করেছি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কোম্পানির মনোভাব যে অসঙ্গত তা আমি বলতে পারি না। সুতরাং সর্বোত্তম ব্যবস্থা হবে অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেওয়া এবং দুইপক্ষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা। আমি শ্রমিকদের কাছে

---

১০। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮০

বর্তমান বিরোধের সমাপ্তি ঘটাতে এবং মিলের কাজ নির্বিঘ্নে ও দক্ষতার সঙ্গে চালাবার জন্য সর্বোত্তম প্রয়াস করতে আবেদন জানাই।"[১১]

এক্ষেত্রেই সুভাষচন্দ্রের বাস্তবমুখী শ্রমনীতির পরিচয় আমরা পাই। উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় এবং শ্রমিকরাও যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, এবং সর্বোপরি আমাদের দেশের শ্রমিকরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকে সেজন্য সুভাষচন্দ্রের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে দলাদলি থাকবে তা দূর করার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র যখন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখনই আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' এই দুটির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের সমর্থন করেছিলেন এবং দক্ষিণপন্থীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন দেশের স্বার্থে ও শ্রমিকদের স্বার্থে বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য। সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর (তখন তিনি ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি) একটি বিবৃতিতে বলেন, "আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলব যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থীদের যে পারস্পরিক বিবাদ চলছে তাতে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের আবির্ভাব ঘটেছে ও সম্প্রতি তাদের শক্তি ও গুরুত্ব বাড়ছে। এটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আমার মতে এটা বাঞ্ছনীয়ও। আমি দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে আমার ধারণা জন্মেছে যে তাঁরাও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থী-দের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ—যাঁদের সম্পর্কে আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি—এমনও বলেছেন যে একদিন না একদিন বামপন্থীরা নেতৃত্ব দখল করবে। তাই দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের প্রতি কেন অসূয়া পোষণ করবেন আমি তা বুঝতে অক্ষম'। ব্যক্তিগত বিবাদ ও বিতর্কের অন্তরালে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য আছে।

---

১১। সুভাষ রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০

বামপন্থীদের সুনির্দিষ্ট নীতি ও বিশিষ্ট মানসিকতা আছে। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে নিজেদের আদর্শে ভিত্তিতেই বামপন্থীরা জনসমর্থন চাইবে। বস্তুত, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না চালালেই বামপন্থীদের উদ্দেশ্য বেশী সফল হবে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদে হুইটলি কমিশন সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর ভোট নেবার আগেই আমি এই নৈর্ব্যক্তিক বিসম্বাদ অবাঞ্ছনীয় মনে করি। তাছাড়াও আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে দক্ষিণপন্থীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলাও তেমনি ভুল।[১২]

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯২৯ সালের জুন মাসে ব্রিটেনে শ্রমিকদল সরকার গঠন করার পর ভারতবর্ষে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য মিঃ হুইটলির সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনই হুইটলি কমিশন ( Royal Commission on Labour ) নামে খ্যাত। ব্রিটিশ সরকার এই কমিশনে দুইজন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে মনোনীত করেন—একজন বোম্বাইয়ের শ্রী এন. এম. যোশী এবং আরেকজন লাহোরের শ্রী চমনলাল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা হুইটলি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হলে বামপন্থীরা তাতে আপত্তি করেন এবং তার ফলে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়। সুভাষচন্দ্র হুইটলি কমিশনে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য রাখার বিপক্ষে ছিলেন।

১৯২৯ সালে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষতঃ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে অর্থনৈতিক মন্দা পরিলক্ষিত হয় তাতে ভারতে ব্রিটিশ মালিকানাধীন শিল্পগুলিও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে তখন শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানো অথবা বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘট চালিয়ে গেলে শ্রমিকদেরই ক্ষতি। বজবজে তেলকলে প্রায় ছয় হাজার কর্মী ১৯২৯ সালে দীর্ঘদিন ধর্মঘট করেছিল। সুভাষচন্দ্র সেই ধর্মঘটে

১২। সুভাষ রচানাবলী, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৭৮-২৭৯,

শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেও দীর্ঘদিনের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না ; কারণ তাতে শ্রমিকদেরই ক্ষতি হত। ১৯৩১ সালে ২২জুন বজবজে একটি সভায় সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, "তেলকলের মালিকদের শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হবে এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। শ্রমিক-ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করলেও দেশে ব্যবসায়ে মন্দার জন্য বর্তমানে শ্রমিকদের সকল প্রকার দাবির মীমাংসা সম্ভব নয়। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সময় আসবে যখন শ্রমিকদের অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হবে। শ্রমিক-ঐক্যের জন্য ইউরোপে শ্রমিকরা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষে এই রকম সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।"[১৩]

তবে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি সুরক্ষিত হবেনা এ জিনিসটাই তিনি শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্ট অভিমত আমরা দেখতে পাই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ( All India Trade Union Congress ) একাদশ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে ( ৫ জুলাই, ১৯৩১ )। এই অধিবেশনের আগেই ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের ফলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্র এই ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের এখনো বৈদেশিক সংস্থাভুক্তির প্রয়োজন নেই, ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিজের দায়িত্ব নিজেই বহন করুক—এই অবস্থা চলতে পারে। প্রত্যেকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবে, এমন কি পৃথিবীর যে-কোনো অংশ থেকে সাহায্য এলে তা গ্রহণ করতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু আমস্টারডম কিংবা মস্কোর নির্দেশের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়।"[১৪]

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাবগুলির বাধ্যতামূলক চরিত্র সম্বন্ধে আপস চলতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে যদি

১৩। সুভাষ রচনাবলী ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭,

বেঁচে থাকতে ও কাজ চালাতে হয়, দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি সম্পাদনের জন্য যদি তাকে কাজ করতে হয় তাহলে কংগ্রেসের অনুমোদিত সব ইউনিয়নের উপর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে বাধ্যতামূলক হতে হবে।"[১৫]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সুভাষচন্দ্র হুইটলি কমিশন বয়কটের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে হুইটলি কমিশনের সুপারিশের মধ্যে এমন কয়েকটি জিনিস আছে যেগুলি কার্যকর হলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে তখন তিনি বলেছিলেন, "বর্তমান রিপোর্ট শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকার্যের সমস্যার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে, এবং যদিও আমি হুইটলি কমিশন বয়কট করার পক্ষে মত দিয়েছিলাম, আমার বলতে দ্বিধা নেই যে এই বিষয়ে সুপারিশগুলি কার্যকর করা হলে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে।"[১৬] তবে তিনি একথাও বলেছিলেন যে হুইটলি কমিশনের রিপোর্টে কয়েকটি বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুবিচার করা হয়নি। বর্তমানে বেকার সমস্যার ভয়াবহতার কথা মনে রেখে আমরা নাগরিকদের কর্মসংস্থানের মৌলিক অধিকারের দাবি তুলি; কিন্তু সুভাষচন্দ্র ১৯৩১ সালেই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "আজকের শ্রমিকরা কর্মলাভের অধিকার চান। নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং যেখানে রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, সেখানে তার উচিত তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা।"[১৭] শুধু কাজের অধিকার-ই নয়, শ্রমিকদের বাঁচবার মতো বেতন (living wage) যাতে সুনিশ্চিত হয়, সেজন্য সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন, 'যেমন প্রতিটি শ্রমিক কর্মে নিয়োগের অধিকার দাবি করতে পারেন তেমনিই তিনি বাঁচবার মতো বেতনের অধিকারও দাবি করতে পারেন। আজ কি ভারতে কারখানায় শ্রমিক বাঁচবার মতো মজুরি পান? চটকলগুলি ও কাপড়ের

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৮

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১২০-১২১

১৭। ঐ পৃষ্ঠা ১২১

কলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা দরিদ্র ও নির্যাতিত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তাদের বিপুল লাভের কোনো অংশ ব্যয় করেছে কি?"[১৮] হুইটলি কমিশনের রিপোর্টে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অসুখ, ছাঁটাই ও বাঁচবার মতো মজুরির প্রধান সমস্যাগুলি যথোচিতভাবে বিবেচিত হয়নি বলে সুভাষচন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে হলে শুধু সরকার বা কল-কারখানার মালিকদের দয়ার উপর নির্ভর না করে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উচিত নিজেদের সুসংহত করে দাবি আদায়ে তৎপর হওয়া,—সুভাষচন্দ্র এই জিনিসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "আমি খুবই দৃঢ়ভাবে মনে করি যে ভারতে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল ও অসংগঠিত অবস্থায় আছে। সুতরাং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কর্তব্য হল সংগঠন ও সংহতি সাধনের কাজে আমাদের সকল সময় ও উদ্যোগ নিয়োগ করা। এই কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমরা শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কিছুই করতে পারব না।"[১৯]

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, বেকার সমস্যার সমাধান, শিল্পে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ শ্রমিকদের প্রদান করা (Profit Sharing Scheme), শ্রমিকদের কাজের অবস্থার উন্নতি করা এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, প্রভৃতি বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং একজন সার্থক শ্রমিক-নেতা হিসাবে তিনি এই সমস্যাগুলির দিকে বারবার সরকার ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আধুনিক শ্রম-অর্থনীতিতে (Labour Economics) আমরা মজুরি নিয়ন্ত্রণ (Wage regulation) সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security), শ্রমিক মালিকের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন (Profit Sharing Scheme), প্রভৃতি তত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করে থাকি। এগুলি বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের কী ভূমিকা তা নিয়ে আমাদের দেশে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ হয়েছিল হুইটলি কমিশন এদেশে

১৮। ঐ

১৯। ঐ পৃষ্ঠা ১২৩

আসার আগে। শ্রমিকদের এই দাবিগুলি পূরণ করার জন্য সুভাষচন্দ্র কত তৎপর ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁর বিভিন্ন ভাষণে। ১৯৩১ সালের ১০ই অক্টোবর বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি যে সব উক্তি করেছিলেন সেগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে উঠছে। রাশিয়ায় পুরোপুরি শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে ধনতন্ত্রবাদীদের অস্তিত্ব নেই। ইংল্যাণ্ডও সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতও সে-পথে যাবে না কেন তার কোনো কারণ নেই। সম্পদ উৎপাদনকারীদের সম্মুখে ধনিক শ্রেণীকে তাঁদের গর্বিত শির নত করতে হবে। অন্যথায় তাঁরা বিপন্ন হবেন।

"ভারতের শ্রমিকদের দাবি সমতাভিত্তিক, ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ। তাঁরা মানব সমাজের প্রাথমিক অধিকার দাবি করেন অর্থাৎ পূর্ণ উদরে আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অন্যান্য সুযোগের দাবি করেন। তাঁরা নিজেদের ঘরের দায়িত্ব অর্থাৎ নিজেদের দেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চান। ব্রিটিশ শ্রমিকরা যদি নিজেদের দেশে এই অধিকার ভোগ করতে পারেন তাহলে ভারতীয় শ্রমিকরাও কেন সেই অধিকার পাবেন না?

" ·ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ বর্তমান তার জন্য পুরোপুরি দায়ী ধনিকদের অনমনীয় মনোভাব। শ্রমিকদের দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে ধানবাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপকৌশলের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি।"[২০]

চটকল কর্মীদের সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "যদি দুইলক্ষ চটকল কর্মীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় এবং একটি বলিষ্ঠ সংগঠনের আওতায় (যেমন, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) তাঁদের আনা যায় তাহলে তাঁদের অভিযানগুলির প্রতিকার সহজসাধ্য হয়। যতদিন তাঁরা দুর্বল থাকবেন চটকল মালিকেরা তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন

২০। সুভাষ রচনাবলী, ঐ তৃতীয় খণ্ড ১৫৬-১৫৭

করবেন না। তাঁদের আমি ধর্মঘট করতে বলি না। কেননা ধর্মঘট হল শেষ ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু তাঁরা একবার সঙ্ঘবদ্ধ হলে ধর্মঘট না করেও তাঁরা তাঁদের অধিকাংশ অভিযোগের প্রতিকার সহজে করতে পারেন।"[২১] বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বেকার শ্রমিকদেব ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করেন, এবং বলেন যে তার টাকা আসবে সরকারকে বেশী করে ধনিকশ্রেণীর উপর কর নির্ধারণ করা থেকে। আরও একটি জিনিসের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা হল চট শিল্প থেকে মালিকের যে বিপুল পরিমাণ লাভ হয় (তখনকার দিনে শতকরা ৪০০ ভাগ এবং কখনো বা শতকরা ৫০০ ভাগ) তার একটি অংশ শ্রমিকদের দেওয়া। তখনকার দিনে লভ্যাংশ বিভাজন নীতি ( Profit Sharing Scheme ) নিয়ে এত জোরালো বক্তব্য আর কোনো শ্রমিক নেতা রাখেননি। সুভাষ-চন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, চটকল মালিকদের এত লাভ হওয়ার কারণ ছিল দুইটি, (১) পাটচাষীদের তাদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে সস্তায় পাট কেনা, এবং (২) শ্রমিকদের অফুরন্ত যোগান ( unlimited supply of labour ) হেতু সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ করা অর্থাৎ মজুরি-বাবদ খরচ করা। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল, চটকল মালিকদের এই লাভের একটি অংশ শ্রমিকরা ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারে।

চটকলমালিকরা শ্রমিকদের দিয়ে দুই সিফ্‌টের জায়গায় এক সিফট কাজ করানোর ফলে শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় কষ্টের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এজন্য ৮০ হাজার কর্মী বেকার হয়ে পড়েছিল ( ১৯৩১ সালে ) তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সুভাষচন্দ্র চটকল শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশের শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা স্বল্পপরিসরে করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা খুব সংক্ষেপে শ্রমিকনেতা সুভাষচন্দ্রের একটি পরিচয় দিয়েছি এবং দেখাতে চেয়েছি যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক

২১। ঐ পৃষ্ঠা ১৫৭

চিন্তার একটি ধারা উন্মোচিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের তাত্ত্বিক বা আদর্শগত দিক সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের একটি উক্তি দিয়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করব। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "অতীতে সামরিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তি ও আয়তনে বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বিভিন্ন চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা কোন্ পথ কিংবা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করবেন যে সম্বন্ধে তাঁরা কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। একপক্ষে আছেন দক্ষিণপন্থীরা যাঁরা সব-কিছুর উর্দ্ধে সংস্কারমূলক কর্মসূচী চান। অপর দিকে আছেন আমাদের কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা এবং তাঁদের যদি আমি ঠিক চিনে থাকি তাঁরা হলেন মস্কোর ঘনিষ্ট সহযোগী ও অনুগামী। এই দুইটি গোষ্ঠীর কোনোটির মানসিকতা কিংবা অভিমতের সঙ্গে আমাদের মিল হোক বা না হোক্, আমরা তাঁদের বুঝতে ভুল করতে পারিনা। এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি গোষ্ঠী যাঁরা সমাজতন্ত্রের, পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের ধারক। কিন্তু তাঁরা চান যে ভারত তার নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাবে এবং তা রূপায়ণের পন্থা খুঁজে বের করবে। আমি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সবিনয়ে এই দাবি জানাই! আমার মনে এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে ভারতের মুক্তি ও সেইসঙ্গে পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের উপর। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করতে হবে কিন্তু ভারতকে নিজের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সমাজতন্ত্র রূপায়ণের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। কোনো তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে আপনি কখনো ভূগোল কিংবা ইতিহাসকে বাদ দিতে পারেননা। এই ধরনের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি আরো মনে করি যে ভারতের উচিত নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্রের জন্ম দেওয়া। যখন গোটা পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছে তখন আমরাই বা তা করব না কেন? এমন হতে পারে যে ভারতে যে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হবে তার মধ্যে এমন নূতন ও অভিনব কিছু থাকবে যা গোটা পৃথিবীর উপকারে আসবে।"[২২]

---

২২। নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে (৪ঠা জুলাই, ১৯৩১) প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। সুভাষরচনাবলী—তৃতীয় খণ্ড, ঐ পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫।

## সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তার সমন্বয়

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অমর দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের গোড়ার কথা ছিল দেশকে পরাধীনতার থেকে মুক্ত করা, এবং সবরকম দাসত্ব ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ বলতে এটাই সব নয়। তাঁর নিজের ভাষায়, "আমরা হয়তো আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়ো। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন। আমরা চাই আমাদের দেশে প্রত্যেক নরনারী আমাদের অখণ্ড জাতি, সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক্। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটি সোপান মাত্র। আমাদের সামনে যে আদর্শ রয়েছে যে স্বপ্ন আমাদের বিভোর করে রেখেছে সে অতি উঁচু। সেই স্বপ্ন ও আদর্শকে আমরা কতটা বাস্তব জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারব জানি না। ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা যে পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ। আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়ে বেশি শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমাদের যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে,—সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি।"[১]

১৯২৯ সালে মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯২১ সাল থেকে যে কর্মসূচী নিয়ে দেশ চলছে, সে কর্মসূচী যথেষ্ট নয়। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়, "আমার আদর্শ দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,

১। শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তর ( ২১ জানুয়ারি, ১৯৩৯ ), সুভাষ রচনাবলী-পঞ্চম খণ্ড ঐ, পৃষ্ঠা-৭-৮

ঘরে ঘরে প্রচার করতে হবে।…সমগ্র জাতিকে এখন বুঝিয়ে দিতে হবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ কী। যেদিন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করবে সেদিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে।

"পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদের উপর নূতন সমাজকেগড়ে তুলতে হবে। জাতিভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করতে হবে। নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। অর্থের বৈষম্য দূর করতে হবে এবং বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কী পুরুষ কী নারী) যাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যারা জন্মাবে তারা মানুষ বলে জগৎসভায় পরিগণিত হবে। ভারত আবার জ্ঞানে বিজ্ঞানে—ধর্মে কর্মে—শিক্ষায় দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে জগৎ বরেণ্য হবে।"[২] সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিতে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে বিবেচ্য। প্রথমত, তাঁর আদর্শ হল দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। এক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি" বলাও শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বরাজ নয়। এই মুক্তির সঙ্গে জড়িত রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি যেখানে সর্বোত্তম পন্থায় দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়ে তুলতে হবে।

এই পূর্ণ সাম্যবাদ নিছক তাত্ত্বিক মার্কসবাদ নয়, সমাজে সব মানুষই সমান এবং সবাই সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলও সবাই সমানভাবে ভোগ করবে,—সুভাষচন্দ্র তা-ই বলতে চেয়েছেন। এই পূর্ণ সাম্যবাদের কথা ভারতে নূতন নয়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির আদি কথাই হল, সব মানুষ অমৃতের পুত্র, সবাই সমান। কিন্তু এক্ষেত্রে এই পূর্ণ সাম্যবাদ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করবে, ও সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করবে।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned economy)। সুভাষচন্দ্রের পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে এই উক্তিটি গভীরভাবে জড়িত। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায় করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারতসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে (২৮ মার্চ, ১৯৩১)। সুভাষচন্দ্র এই ভাষণে বলেছিলেন, "যে-সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ মানুষকে কর্ম ও উদ্যমের পথে প্রেরণা দেয় আমরা যদি সেগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কয়েকটি সাধারণ মূল সূত্রে উপনীত হব। কোন্ নীতি ও আদর্শের জন্য জীবনধারণ সার্থক তা যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুসন্ধান করে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলেও একই ফল পাব। যে পথই অনুসরণ করা হোক্ না, আমার মনে হয় যে-সব নীতি আমাদের সমষ্টি জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত, তা হল—ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম। একথা নিয়ে তর্ক করা অনাবশ্যক যে আমাদের সকল কাজ ও সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত ন্যায়। ন্যায়পূর্ণ ও নিরপেক্ষ হবার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের প্রতি আমাদের সম-আচরণ করতে হবে। সকল মানুষকে সমান করে তুলতে হলে সকল মানুষের প্রতি সম-আচরণ করা দরকার। সাম্য আনতে হলে স্বাধীনতা দিতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে ও নানাবিধ অসাম্যের জন্ম দেয়। অতএব সাম্য আনার উদ্দেশ্যে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—এই সবরকম বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা বা যা-খুশি করার অধিকার নয়। স্বাধীনতার অর্থ আইনের অভাব নয়। এর অর্থ শুধু এই যে বিদেশীরা যে যে আইন ও শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিয়েছে তার বদলে আমাদের নিজেদের প্রণীত আইন ও শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা।.. এই সকল মূলনীতি, যথা, ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা—তাদের মধ্যে অনুস্যূত আছে আর-একটি উচ্চতর নীতি —প্রেম। যদি মানবতার প্রতি ভালোবাসায় আমরা অনুপ্রাণিত না হই তাহলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে পারব না, সকল মানুষের

প্রতি সম-আচরণ করতে পারব না, স্বাধীনতা চাইতে পারব না বা যথার্থ শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারব না। তাই আমার মতে এই পাঁচটি নীতি আমাদের সমষ্টি জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। আরো অগ্রসর হয়ে আমি বলব যে সমাজতন্ত্র বলতে আমি যা বুঝি এবং ভারতের যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আমি দেখতে চাই তার অন্তর্বস্তু এই পাঁচটি নীতি নিয়েই গঠিত।"[৩]

সুভাষচন্দ্র স্বীকার করতেন যে মানবজাতিকে দেবার মতো বহু শিক্ষা আজ বলশেভিকবাদের আছে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না যে একই মাত্রায় একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতি এবং দেশের ক্ষেত্রে বিমূর্ত ভাবধারা প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি মনে করতেন, রাশিয়ার পরিস্থিতিতে যেমন মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে বলশেভিকবাদের জন্ম হয়েছে, ঠিক একই ভাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে সমাজবাদের প্রয়োগে নূতন ধাঁচের সমাজবাদ গড়ে উঠবে। অপর দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "বর্তমানে বলশেভিক মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মার্কসের গোড়াকার তত্ত্ব থেকেই যে কেবলমাত্র সরে আসা হয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্বে লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিকরা যে মতবাদ পোষণ করতেন তা-ও বর্জিত হয়েছে। রাশিয়ার তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতি আদি মার্কসবাদ বা বলশেভিকবাদের সংশোধিত পথ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাশিয়ার যে পদ্ধতি এবং কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল, ভারতীয় পরিস্থিতিতে তা যে উপযোগী হবে না, এ-কথা বলতে পারি।···আমি ভারতে একটি সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের (Socialist Republic) প্রতিষ্ঠা দেখতেচাই।"[৪] সুভাষচন্দ্র যে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের কথা বলতে চেয়েছিলেন তার প্রধান অঙ্গ ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সম্পুর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি। সম্পুর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি বলতে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, প্রত্যেকের কাজের অধিকার ( Right to work ) এবং জীবনধারণোপযোগী বেতন। তাঁর অভিমত ছিল, সমাজে অলস

৩। সুভাষ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭-৭৮

৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৯,

ব্যক্তিদের স্থান থাকবে না এবং সকলেরই সমান সুযোগ থাকবে। সর্বোপরি সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন, ন্যায্য ও ক্ষমতা সম্পন্ন সুযোগ চাই এবং এই কারণে উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হওয়া অপরিহার্য হতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি জিনিসের উপর সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—তা হল সামাজিক সাম্য। সুভাষচন্দ্রের মতে সামাজিক সমতার অর্থ হল জাত-পাতের কিংবা অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা থাকবে না, সমাজে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, সম-মর্যাদা এবং সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারের স্বীকৃতি থাকবে ও আইনগত মর্যাদায় কোনো বৈষম্য থাকবে না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, সুভাষচন্দ্রের মতে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তির শর্ত হল কাজের অধিকার, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ও সমবণ্টন এবং রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব অর্জন করা। প্রথম শর্তটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব (যেমন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র)। তবে কোনো কোনো দেশ সমাজতান্ত্রিক না হয়েও (যেমন ব্রিটেন, সুইডেন প্রভৃতি), কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কাজের সুযোগ না দিতে পারলে বেকার ভাতা দিয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। আমরা আগেই দেখেছি সুভাষচন্দ্র ছিলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গোঁড়া সমর্থক এবং ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার তিনিই ছিলেন পুরোধা। পরিকল্পিত অর্থনীতিতেই দেশের দ্রুত শিল্পায়ন অর্জন করা সম্ভব। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে দেশের সব শিল্পগুলির উন্নয়ন হলে মুষ্টিমেয় ধনী লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাগুলি অপরিহার্য। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুভাষচন্দ্র যে-সব ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন সে-গুলিও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত। এক্ষেত্রে আমরা সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের পূর্ণ সমন্বয় দেখতে পাই।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনে (১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮) সভাপতির হিসাবে তাঁর ভাষণ এবং পাবনা জেলা যুব-সম্মিলনীতে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণেরও উল্লেখ করতে পারি। করাচীতে নওজোয়ান ভারতসভায় প্রদত্ত ভাষণের আগেই এই ভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল। প্রথমোক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মত ও কর্মপ্রণালীর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়, যথা—Socialism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি। এই-সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনো কোনো মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। দ্বিতীয়ত, একথা ভুললে চলবেনা যে কোনো দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করে এনে বলপূর্বক অন্যদেশে রোপণ করলে সুফল না ফলতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন থেকে। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

"আপনারা জানেন যে, Marxism-এর তরঙ্গ এদেশে এসে পৌঁছেছে। এই তরঙ্গের আঘাতে কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা রাশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রাশিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তার সঙ্গে Marxian Socialism-

এর মিল যতটা আছে—পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রাশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করবার সময় প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলে যায়নি। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখে কতটা সুখী হতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সামাজিক আদর্শ একই ভাবে রূপান্তরিত না হয়ে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ-সব কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধ ভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।"[5]

সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তাঁর মতে পরাধীন দেশে যদি কোনো 'বাদ' সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হয় তবে তা nationalism. অথচ সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যদিও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যেটা রাশিয়ায় প্রচলিত সমাজতন্ত্র থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সুভাষচন্দ্র জানতেন, যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের রূপরেখা কী হবে তা নিয়েই তিনি ছিলেন বেশী চিন্তিত এবং এজন্য তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও শক্তি সেদিকে প্রবাহিত করেছিলেন। দেশের যুব-আন্দোলন কিভাবে গড়ে ওঠা উচিত সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য আমরা পাই, পাবনা জেলা যুব-সম্মেলনের ভাষণে। এই সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, "এক-একটি "ism"-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হবে। আজকাল তাই কোনো কোনো দেশে "ism"-এর লড়াই খুব ঘনিয়ে উঠেছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনো ism-এর মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ না করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই

---

৫। সুভাষ রচনাবলী, ২য় খণ্ড (ঐ) পৃষ্ঠা ৩-৪,

বলতেন—man-making is my mission. মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠন এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে হলে সবদিক দিয়ে তার বিকাশ হওয়া চাই। এটা থেকে প্রতিপন্ন হবে যে যুব-আন্দোলনের সঙ্গে Socialism বা সমাজতন্ত্রবাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা—সেই সমস্যার সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ। "তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে—আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক থেকে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা।...জাতীয়তার দিক থেকে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়ে তোলা।"[৬]

সুভাষচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র ছিল নূতন জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন, যেখানে সাধারণ মানুষ, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব থেকে মুক্ত থাকবে। রাজনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির বনিয়াদ কখনই দৃঢ় হয়না যদি জাতি অর্থ-নৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে না এগোয়। সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বের সর্বহারা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য Karl Marx যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী না হয়েও ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত সব দাবি আদায় করতে এবং সুস্থ জীবনযাত্রা (উপযুক্ত মজুরি, কাজের পরিবেশ ও কাজের অধিকার সহ) সুনিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মার্কসের সমাজতন্ত্র যে পুরোপুরি আমাদের দেশে চলে না সুভাষচন্দ্র তা জানতেন; কিন্তু রাশিয়ায় যে-ভাবে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছিল তা যে ভারতের পক্ষে অপরিহার্য তা-ও তিনি বিশ্বাস করতেন। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর সুভাষচন্দ্র "ফরোয়ার্ড ব্লক" (Forward

৬। সুভাষ রচনাবলী, ঐ, পৃষ্ঠা-৩১-৩২।

Bloc ) নামে নূতন দল গঠন করেন। এই দলের কর্মসূচীতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিস্কারভাবে পরিস্ফুট হয়। সুভাষচন্দ্রের মতে ফরোয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য ছিল এমন একটি কর্মসূচী ও নীতি অনুসরণ করা যা দেশের সব বামপন্থী শক্তিকে একত্রিত করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাম সংহতি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল দেশের বামপন্থী শক্তিগুলি সুসংহত হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হবে এবং দেশে একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করাও সম্ভব। অবশ্য এই নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হল অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন। "The Indian Struggle 1935-42" বইয়ে এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যে আগেকার প্রজন্মের অভিজ্ঞতা এবং বিগত দিনের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা নূতন ভারত গঠনে খুব কাজে লাগবে না। স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা হবে ভিন্নরূপ। দেশের শিল্প, কৃষি, মুদ্রা ব্যবস্থা, শিক্ষা জনস্বাস্থ্য, ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতি নূতন করে ঢেলে সাজাতে হবে। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমরা নূতন অর্থনীতির সৃষ্টি হতে দেখেছি। ভারতেও তাই ঘটবে। মার্শাল এবং পিগো আমাদের যে অর্থনীতির শিক্ষা দিয়েছেন, ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধানে তা কাজে লাগবে না।[৭]

এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র একটি খাঁটি কথা বলেছিলেন। মার্শাল তার অবিস্মরণীয়

৭। "The experience of the older generation and of the teachers of the past will not be of much avail. The socio-economic conditions of free India will be altogether different from what prevails now. In industry, agriculture, land tenure, money, exchange, currency, education, prison administration, public health, etc. new theories and novel experiments will have to he devised. We know, for example, that in Soviet Russia a new scheme of national ( or political ) economy has been evolved in keeping with the facts and conditions of the land. The same thing will happen to India. In solving our economic problem, Pigou and Marshall will not be of much help." The Indian Struggle 1935-42, Subhas chandra Bose Page 72.

"Principles of Economics" বইয়ে অর্থনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক পিগোও তাঁর "Economics of Welfare" বইয়ে কল্যাণধর্মী অর্থ নৈতিক তত্ত্বের কথা বলেছেন। তাছাড়া পিগো তাঁর অন্যান্য বইয়ে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে Monetary Theory-র কোনো কোনো দিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যাবলীর স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। অর্থনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অর্থশাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ দরকার এবং এজন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দরকার। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার সময় দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীগণ সুভাষচন্দ্রের এই অর্থ নৈতিক চিন্তাধারাকে সমর্থন করেননি। কেন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন,·· "The third item in the charge sheet was my sponsoring and subsequent inauguration of of the National Planning Committee which in the view of Gandhiites, would give a fillip to large-scale production at the sacrifice of village industries, the revival of which was a very important item in the Gandhian constructive programme."[৮] সুভাষচন্দ্র বামপন্থী শক্তিগুলিকে কেন সুসংহত করতে চেয়েছিলেন তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙ্গে ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তন করা। তাঁর এই অর্থ নৈতিক চেতনা ছিল আপসহীন এবং তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভেতরের শেকড় থেকেই এটা গড়ে ওঠে এবং প্রতি স্তরে তার নূতন শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয় যাতে এটা প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। যদি আন্দো-লনের মূলধারা অবক্ষয়ের পথে যেতে আরম্ভ করে তবে একটি বামপন্থী

---

৮। Ibid P. 81.

চেতনার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই বামপন্থী শাখার কাজ হল প্রগতির প্রচেষ্টাকে মদত দেওয়া। বামপন্থী শাখার সৃষ্টি হলে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তার সংঘাত হবে, এবং এই সংঘাতের পর সৃষ্টি হবে একটি সমন্বয় ( synthesis )। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো মতবাদই চূড়ান্ত নয়। যদি ইতিহাসের গতি থেমে না যায়, যদি সৃষ্টির পথ রুদ্ধ না হয়, তবে বলা যাবে না যে এই একটি পথই চূড়ান্ত। বাদ (thesis) প্রতিবাদ ( antithesis ) এবং পরিণাম বা সমন্বয় ( synthesis ) এই এই তিনটি জিনিসের কথা সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের উক্তি হল, "One may describe this process of evolution in Philosophical language by saying that the "thesis" throws up its "antithesis" and the conflict between the two is resovled in a "synthesis". This "synthesis" in its turn, becomes the "thesis" of the next stage of evolution."[১] এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় "dialectical process." ভারতের ক্ষেত্রেও এই জিনিস কিভাবে প্রযোজ্য সুভাষচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীদের জেহাদ আলোচনা প্রসঙ্গে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধির বাইরে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বামপন্থী ধারণা ( Leftism ) বলতে সুভাষচন্দ্র কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। সুভাষ-চন্দ্রের মতে ভারতের তৎকালীন পরিবেশে বামপন্থী ধারণার অর্থ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা। একজন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলতে সুভাষচন্দ্র তাকেই বুঝতেন যিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিসাবে অবিমিশ্র স্বাধীনতায় ( গান্ধীজী যেভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সেভাবে নয় ) বিশ্বাস করতেন এবং তা অর্জন করার জন্য আপসহীন জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। স্বাধীনতা লাভের পর বামপন্থী চেতনা রূপান্তরিত হবে সমাজবাদে এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করাই হবে তখন বামপন্থীদের কাজ। রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি অর্জন করার আগেই সমাজতন্ত্র অথবা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন আসবে

১। Ibid. P. 77.

না।[১০] সুভাষচন্দ্রের মতে গান্ধীবাদের সঙ্গে বামপন্থী মূল চেতনার মূল পার্থক্য হল, গান্ধীবাদ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত আপসে এসেছিল; গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অথবা আইন অমান্য আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আপসের পথ ধরেছিল। সামাজিক ভাবে গান্ধীবাদ কায়েমী স্বার্থের (vested interests) সঙ্গে যুক্ত ছিল; সর্বহারাদের (have-nots) মধ্যে শ্রেণী চেতনার উন্মেষ হতেই গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য সম্প্রসারিত হচ্ছিল। এজন্য সুভাষচন্দ্রের মতে কুড়ি বছর আগে (১৯২০-২১ সালে) যা ছিল, তার তুলনায় ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হবার পর গান্ধীবাদ কৃষকদের একটি বিরাট অংশ এবং কারখানা শ্রমিকদের কাছে ততটা আকর্ষণীয় ছিল না, এবং গরীব জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ছাত্র সমাজের একটি বিরাট অংশের কাছেও গান্ধীবাদের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের এই ধারণাটিও যে অমূলক ছিলনা তা আজকের পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্র যে পথে জাতীয় পুনর্গঠন চেয়েছিলেন, তা আজও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু গান্ধীবাদের প্রতি সমর্থন বর্তমানে দেশ থেকে ক্রমেই দূর হয়ে যাচ্ছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ভাষণ হল টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে (নভেম্বর ১৯৪৪)। এই ভাষণটি তাঁর Indian Struggle বইয়ের পরিশিষ্টে "The Fundamental Problems of India" নামে ছাপা হয়েছে। এই ভাষণে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা দেখতে পাই এবং এই আদর্শের সঙ্গে তাঁর অর্থ নৈতিক

১০। "A genuine anti-imperialist is one who believes in undiluted independence (not Mahatma Gandhi's substance of independence) as the political objective and in uncompromising national struggle as the means for attaining it. After the attainment of political independence Leftism will mean Socialism and the task before the people will then be the reconstruction of national life on a socialist basis. Socialism or Socialist reconstruction before achieving our political emancipation is altogether premature." Ibid P. 95.

চিন্তাধারার একটি আশ্চর্য সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিরূপ হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল, যদি আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থ নৈতিক কাঠামো তৈরি করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক কাঠামো এমন হতে হবে যাতে আমরা আমাদের অর্থ নৈতিক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোয় রাষ্ট্রের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু রাশিয়ায় যেভাবে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে ভারতের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুভাষচন্দ্র জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism) এবং সাম্য বাদের (Communism) তুলনা করেছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপে জাতীয় সমাজতন্ত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আনতে পারলেও দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার করতে পারেনি এবং ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে (capitalistic basis) গড়া অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। অপরদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট সরকারের কৃতিত্ব হল একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি গঠন করা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম পছন্দ করেননি। তার কারণ প্রথমতঃ কমিউনিজম্-এ জাতীয় ভাবানুভূতির প্রশ্রয় (appreciation of the value of national sentiment) নেই। দ্বিতীয়ত, ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলা অপ্রয়োজনীয় হবে যদি স্বাধীন ভারতে সরকার জনগণেরই মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং রাষ্ট্রকেই জনগণের ভৃত্যে পরিণত করা হয় (by making the State the servant of the masses)। তৃতীয়ত, রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারত প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশে কৃষকদের সমস্যা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থত, মার্কসবাদ মানবজীবনে অর্থ নৈতিক উপাদানের উপর (economic factor in human life) অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুভাষচন্দ্র অর্থ নৈতিক উপাদানের গুরুত্ব স্বীকার করলেও মার্কসবাদে তাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ততটা দিতে রাজী ছিলেন না।

সুভাষচন্দ্র জাতীয় সমাজবাদকেও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি, কমিউনিজমকেও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। যদিও অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য, বিশেষ করে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত অর্থ-নীতির পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি রাশিয়ার প্রশংসায় মুখর ছিলেন, তবুও কমিউনিজমকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এই গ্রহণ করতে না পারার আরও কারণ ছিল। কারণ কমিউনিজম নাস্তিক্যবাদী ও ধর্ম-বিরোধী, এবং কমিউনিষ্ট থিয়োরীর প্রধান বস্তু ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। ভাবপ্রবণ এবং ধর্মভীরু ভারতীয়দের কাছে কমিউনিজমের এই দিকটির আবেদন খুবগভীর নয়। এজন্য সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেনজাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় বা সিনথীসিস (synthesis) আনতে। সেজন্য এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "To repeat once again, our political philosophy should be a synthesis between National Socialism and Communism. The conflict between thesis and antithesis has to be resolved in a higher synthesis. This is what the Law of Dialectic demands. If this is not done, then human progress will come to an end".[১০] ভারতবর্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা জানতে চায়, তার রাজনৈতিক পদ্ধতি নিতে চায় না; কারণ বিদেশী প্রভাবে গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির মতো কোনো পার্টিতে ভারতের প্রয়োজন নেই। স্বাধীন ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি যথেষ্ট ক্ষমতা-শালী হয়েছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে পূর্বতন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির এবং ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) উভয় দলই যথেষ্ট পরিমাণে মার্কসবাদের মূল ভাবধারা থেকে দূরে সরে এসেছে। তারা সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের অনেকটা খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন ভারতের যে-কোনো রাজনৈতিক দলকেই ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাধারণ মানুষের ভাবানুভূতি, প্রভৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। সেজন্যই তিনি সিনথীসিসের কথা বলেছিলেন।

কিন্তু অর্থ নৈতিক নীতি ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার উদাহরণকে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ এবং অর্থ নৈতিক চিন্তার সমন্বয় আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাই।

এই প্রসঙ্গে লণ্ডন "Daily Worker" কাগজে রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি সাক্ষাৎকারের কথা (১৯৩৮ এর ২৪শে জানুয়ারি) উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২] রজনী পাম দত্ত সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার "The Indian Struggle" বইয়ের শেষের দিকে ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদের উপর আপনার অভিমত সম্পর্কে আপনি কি কোনো মন্তব্য করতে চান? ওই অংশেই কমিউনিজম সম্পর্কে আপনার সমালোচনা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তার উপরেও কি কোন মন্তব্য করতে চান?" সুভাষচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "তিন বছর আগে ওই বই লেখার পর থেকে আমার রাজনৈতিক ধারণা আরও পরিণতি লাভ করেছে। আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতে আমরা চাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা লাভ করার পর, সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। "কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের" উল্লেখ করে এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবতঃ যে ভাষায় আমি তা প্রকাশ করেছি তা তেমন সন্তোষজনক হয়নি, তবে আমার দিক থেকে এ কথাও বলে রাখা উচিত যে, যখন আমি বইটি লিখছিলাম, ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তখনও আরম্ভ করেনি এবং আমার কাছে তা মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদেরই একটা উগ্র সংস্করণ।

"এ কথাও আমার বলা দরকার যে, ভারতে যাঁরা কমিউনিস্টপন্থী বলে জাহির করতেন তাঁদের কার্যকলাপ থেকে আমার মনে হয়েছিল তাঁরা জাতীয়তাবিরোধী, এবং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন তাঁদের মধ্যে

১২। Crossroads,—Subhas Chandra Bose. অনুবাদ, "কোন্ পথে?" সম্পাদনা—শিশির কুমার বসু (১ম খণ্ড) কথা ও কাহিনী, পৃষ্ঠা ৪০-৪১

বেশ কয়েকজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করেন। আজ অবস্থা যে মূলতঃ পাল্টে গেছে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

"আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। মার্কস ও লেনিনের লেখা থেকে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নীতি সংক্রান্ত সরকারী বিবৃতি থেকে কমিউনিজমকে জানা যায়। আমার বরাবর ধারণা এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই কমিউনিজম জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং তা তার বিশ্ববীক্ষার অঙ্গাঙ্গী অংশ বলেই স্বীকৃত।

"আজকের দিনে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে সংগঠিত করা উচিত এবং তার দুটি লক্ষ্য থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।"

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ আলোচনা করলে আমরা যে জিনিসটি বিশেষভাবে দেখতে পাই তা হল, যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ যদি পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে এবং সমাজতান্ত্রিক পথে দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনকে সমর্থন করে তবে তার প্রতি সুভাষচন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থনের হাত সর্বদা প্রসারিত। কিন্তু এজন্য এই দুটোর বাইরে যদি সেই রাজনৈতিক মতবাদে এমন কোনো উদ্দেশ্য বা কর্মসূচী থাকে যা ভারতের জাতীয় ভাবানুভূতিকে ( national sentiment ) মর্যাদা দিচ্ছে না তবে তার প্রতি সুভাষচন্দ্রের কোনো সমর্থন ছিল না। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তিশীল ছিল। সেজন্যই তিনি দেশের বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন।

(১) বাম শাখার সংহতি সাধন।

(২) এইরূপ বামপন্থী সংহতির মাধ্যমে কংগ্রেসে প্রকৃত ঐক্য সৃষ্টি এবং

(৩) ঐক্য সাধিত হলে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের জন্য অভিযান আরম্ভ।

বামপন্থী সংহতির জন্য তিনি সব রাজনৈতিক মতবাদেরই

উত্তম বস্তু গ্রহণ করে সমন্বয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজেকে কখনই মার্কসবাদী বলে চিহ্নিত করেন নি। "ফরোয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা" নামক প্রবন্ধে ( ১২ আগস্ট ১৯৩৯ ) সুভাষচন্দ্র বলেছিলে,—"একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে মার্কসবাদী দলের বিকল্পের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে।"[১৩] এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করতেন তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও দেশের পূর্ণ স্বরাজ লাভের আন্দোলনের সামিল করা। যেহেতু এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে সমন্বয় বের করা, সেজন্য সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা না বাড়িয়ে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার দিকটি নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখা উচিত। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার যে বিশ্লেষণ আমরা করেছি তাতে দেখতে পাই, কৃষির উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রস্তাবিত কর্মসূচী ( বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস ) বৃহ শিল্পগুলির জাতীয়করণের মাধ্যমে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ( যাতে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে এগোতে পারে ), কুটির শিল্পের, বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ও অন্যান্য হস্তচালিত গ্রামীণ শিল্পের সংরক্ষণ ( যাতে গ্রামীণ বেকার সমস্যার কিছু সুরাহা হতে পারে ) ইত্যাদি সবই মূলতঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সুভাষচন্দ্র যে-সব প্রস্তাব রেখেছেন সেগুলিও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই সম্ভব। শ্রমিকদের কাজের অধিকার, শিল্পক্ষেত্রে অর্জিত লভ্যাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি, কাজের সময় ও পরিবেশ উন্নত করা, বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত মজুরি, কাজ না থাকলে বেকার ভাতা দেওয়া—এ-সব কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করতে হলেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তা করা সম্ভব।

১৩। Crossroads,—Subhas Chandra Bose P. 179.

একটি অনগ্রসর দেশের পরিকাঠামোয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করতে গেলে রাষ্ট্রকেই সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হয় এবং সেটা সম্ভব হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। সুভাষচন্দ্র এটা জানতেন এবং তাতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করা মানেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যকে খাটো করা নয়। এজন্য আমরা দেখতে পাই সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে একটি সমন্বয় বা সিনথীসিস। যে মতাদর্শের যে জিনিসটা ভাল, সুভাষচন্দ্র সেটাই গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে বজায় রেখেছেন ভারতীয়ত্ব। এই ভারতীয়ত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার সমন্বয়।

## উপসংহার

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল সূত্রগুলি যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে সেগুলি এরূপ দাঁড়ায়।

এক,—সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের বড় সমস্যা, দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা দূর করতে হলে দেশে পূর্ণ স্বরাজ আনতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আপস করে স্বাধীনতা এগিয়ে আনা যাবে না।[১]

দুই,—সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, শুধু চাষবাসে দেশ বড় হতে পারে না; অন্ন সমস্যা ও বেকার সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। যতদিন না ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজদের হাত থেকে অথবা ইংরেজদের মদতপুষ্ট ধনিক-শ্রেণীর হাত থেকে দেশের লোকের হাতে না আসছে ততদিন কোনো আশা নেই। চাকরি করার ক্ষেত্রেও যুবকদের সুযোগ ছিল সীমিত। যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সহায়ক ( development-oriented education ) হয় ইংরেজশাসনে তার অভাব থাকায় এবং মানবিক মূলধনে ব্রিটিশ শাসকদের বিনিয়োগ ( investment in human capital ) একান্ত নগণ্য থাকায় দেশের লোক অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগোতে পারছিল না।

তিন,—সুভাষচন্দ্র দেশের দ্রুত শিল্পায়ন চেয়েছিলেন এবং এজন্য যন্ত্র-শিল্পের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি কৃষিকে উপেক্ষা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল কৃষির দ্রুত

১। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তখন জওহরলাল নেহরু একটি বিবৃতিতে ( ২০মে, ১৯৪০ ) বলেছিলেন, "Launching a civil disobedience campaign at a time when Britain is engaged in a life and death struggle would be an act derogatory to India's honour." অনুরূপভাবে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "We do not seek our independence out of Britain's ruin. This not the way of non-violence." সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছিলেন, "It was clear that the Gandhi wing was doing everything possible in order to arive at a compromise with Britain." The Indian Struggle, Page 34.

উন্নয়নের জন্য, জমিতে একর প্রতি উৎপাদন বাড়াবার জন্য, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা, সার সরবরাহ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি কৃষি-পরিকল্পনা করা দরকার। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কৃষির আধুনিকীকরণের সমর্থক। ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করলে কৃষির উৎপাদন দ্রুত বাড়বে, অথচ এজন্য যে অনেক কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক ( বা ক্ষেতমজুর ) বেকার হয়ে পড়বে সুভাষচন্দ্র সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। এজন্য সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, শিল্পক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ যাতে কৃষির উপজীবিকায় যারা উদ্বৃত্ত শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হবে তারা শহরে এসে যাতে শিল্পক্ষেত্রে কাজের সুযোগ লাভ করতে পারে। এজন্য দরকার দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং সুভাষচন্দ্র নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন ও বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ করে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ সমর্থন করেছিলেন।

চার,—সুভাষচন্দ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জন সংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি তার অন্যতম কারণ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশের বেকার সমস্যাকে তীব্র করেছিল এবং খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদাও বাড়িয়ে দিয়েছিল,—এই দুইটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে, যেখানে দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধি দেশের বুকে বিচরণ করছে যেখানে এক দশকে জনসংখ্যার ৩ কোটি বৃদ্ধি সহ্য করার ক্ষমতা দেশের ছিল না। পরিবার-পরিকল্পনার কথা সেই ভাষণে স্পষ্ট করে সুভাষচন্দ্র বলেননি বটে, কিন্তু তার বক্তব্যে এ জিনিসটার ইঙ্গিত ছিল।

পাঁচ,—দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করাই সুভাষচন্দ্র দেশের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা বলে মনে করতেন। আজকাল আমরা যেমন দেশের poverty line নিয়ে আলোচনা করি, সুভাষচন্দ্র সেভাবে poverty line-এর কথা বলেন নি ; কারণ, তখন দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল গরীব। তখনকার দারিদ্র্য এত ভয়াবহ ছিল যে তার একটি সীমারেখা টানার সম্ভাব্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠত না। গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য সুভাষচন্দ্র জমিদারী প্রথার অবসান সহ ভূমি-ব্যবস্থার

বৈপ্লবিক সংস্কারের সমর্থক ছিলেন। মহাজনদের কাছে ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের সাহায্যের জন্য কৃষি-ঋণের অবসান ঘটানোর প্রয়োজন বলে সুভাষচন্দ্র দাবি করেছিলেন। গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য যাতে সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছিলেন। উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনেরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সুভাষচন্দ্র সে-কথাও বলেছিলেন।

ছয়,—সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দেশকে উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কৃষির উন্নয়নই যথেষ্ট হবে না। এজন্য রাষ্ট্রের মালিকানায় ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার এটাই মূল কথা। সুভাষচন্দ্র ছিলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একনিষ্ঠ সমর্থক। দেশকে একটি শিল্প-বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, কিন্তু এই শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মত হবে না। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, রাশিয়ায় যে পদ্ধতিতে দ্রুত শিল্প-বিপ্লব হয়েছে, অর্থাৎ, যেভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়া নিজেদের শিল্পগুলিকে উন্নত করেছে, ভারতও তাই করুক।

১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় তখন সেদেশে ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন কৃষিজীবী। সুভাষচন্দ্রের আমলে ভারতের অবস্থাও একইরূপ ছিল। রাশিয়া যদি ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর করার পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে দেশের ব্যাপক শিল্প-সম্প্রসারণ করতে পারে, তবে ভারত-ই বা তা পারবে না কেন,—সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে এই বক্তব্য রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের এত আগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর মনঃপূত হয়নি। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত চিন্তাধারা কট্টর গান্ধীবাদীরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের

প্রতিদ্বন্দ্বী ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর "History of the Indian National Congress" বইয়ে দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার ও অবদানের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কট্টর গান্ধীবাদীদের আশঙ্কা ছিল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ হতে থাকলে এবং বৃহৎ শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উন্নত হতে থাকলে দেশের কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ধ্বংস করতে চাননি, বরং তিনি চেয়েছিলেন, যে-সব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিজেদের স্বকীয়তায় বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্যেও টিঁকে থাকতে পারে সেগুলিকে নিশ্চয়ই রক্ষা করা হবে এবং সেগুলির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রসঙ্গত তিনি হস্তচালিত তাঁত শিল্প, হস্তজাত সমগ্রী, রেশম শিল্প, পশম শিল্প প্রভৃতির উন্নয়নের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু, এটা ঠিকই সুভাষচন্দ্র চাইতেন দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া দেশের শিল্পগুলিকে যে দ্রুত সম্প্রসারিত করা যাবে না তা তিনি জানতেন। সুভাষচন্দ্রের মতে, "যে পুরাতন শিল্পপদ্ধতি বিদেশের ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশে বৈদেশিক শাসনের ফলে ভেঙ্গে পড়েছে তার পরিবর্তে নূতন শিল্পপদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক কারখানাগুলির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্বদেশী কোনো কোনো শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিধির উৎপাদন উৎসাহিত করা উচিত পরিকল্পনা কমিশনকে সযত্নে বিবেচনা করতে হবে।' আমরা যতই আধুনিক শিল্পায়ন অপছন্দ করি এবং তার যথায কুফলগুলির নিন্দা করি, আমরা আর ইচ্ছা করলেও শিল্প-পূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারি না",—হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি গান্ধী-বাদীদের অসন্তুষ্ট করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র দেশের সাতটি প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র,—এই কমিটির সভাপতি হবার কথা তাঁরই। তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র জওহরলাল নেহরুকে এই

কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং জওহরলাল তা গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধন করে সুভাষচন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচী কিরূপ হবে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। উন্নয়ন পদ্ধতি ( Development strategy ) সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা যে কত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ছিল আমরা তরে পরিচয় পাই তাঁর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর জাতীয় পুনর্গঠন যদি সমাজতান্ত্রিক ধারায় হয়—তা যে হবে সে বিষয়ে আমার সংশয় নেই—তা হলে সর্বহারাগণ বিত্তবানদের বিনিময়ে লাভবান হবেন। অবশ্য ভারতীয় জনসাধারণকে সর্বহারাদের শ্রেণীতে ফেলতে হয়।"[২] সুভাষচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চেয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অর্থ হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। উৎপাদন ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রিকভাবে কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থার সামাজিক-করণ এক্ষেত্রে অপরিহার্য।[৩] সুভাষচন্দ্র ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ( Socialist Republic ) গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়ই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। সমাজতন্ত্রে সুভাষচন্দ্র আস্থা স্থাপন করেছিলেন এজন্য যে তিনি চাইতেন ব্রিটিশ শাসনে শোষিত গরীব ভারতীয়দের পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি। আয়ের বৈষম্য দূর করে সবাইকে কাজের অধিকার দেওয়া। শ্রমিকদের সব ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণ

২। "...if after the capture of political power, national reconstruction takes place on socialistic lines—as I have no doubt it will—it is the have-nots who will benefit at the expense of the 'haves' and the Indian masses have to be classified among the 'have-nots'—Subhas chandra Bose, Presidential address at Haripura Congress.

৩। হরিপুরা কংগ্রেসে এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "The State will have to adopt a comprehensive scheme for gradually socialising our entire agricultural and industrial system in the sphere of both production and appropriation."

করা, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল দেশবাসীর মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব। সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার কাছ থেকে পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন,—রাশিয়ার রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়। সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমে আস্থা রাখতে পারেননি যদিও কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের তিনি প্রশংসা করতেন। রোমা রোলাঁ ( Romain Rolland ) তাঁর ডায়েরীতে ( এপ্রিল, ১৯৩৫ ) লিখেছেন, "…Bose too seems on the verge of communism ; but he will hear nothing of it." অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাশিয়া যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সুভাষচন্দ্র শুধু সেটাই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়া যেভাবে সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান করেছে করেছে এবং দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করার ব্যবস্থা করেছে, সুভাষচন্দ্র তারও প্রশংসা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে কোনো ক্ষতির কারণ ছিল বলেও সুভাষচন্দ্র মনে করতেন না।[৮] অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাশিয়া যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। Indian Science News Association-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনায় ডক্টর মেঘনাদ সাহার ভাষণের উত্তরে সুভাষচন্দ্র ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতি ও পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতিবিদ না হয়েও তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা কত উঁচুদরের ছিল। ভারত একটি অনগ্রসর দেশ। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গতি-প্রকৃতি বা রূপরেখা কী হবে তা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে ভিত্তি করেই তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক অর্থ-

৮। "…he declares that he would certainly see no harm in the U.S.S.R. helping India to liberate herself." Romain Rolland and Gandhi : Correspondence : Publications Division, Government of India, P. 224.

নীতির ( Theoretical Economics ) চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ফলিত অর্থনীতি ( Applied Economics ) যাতে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে উন্নয়ন-পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। এজন্য প্রত্যেক উন্নয়নকামী দেশেরই উচিত নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তোলা। সুভাষচন্দ্র ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের ভিতরেই যে একটি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ( economic infrastructure ) গড়ে তোলা দরকার, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের নিজস্ব সম্পদ, চাহিদা, উপকরণ ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে যে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা দরকার তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে আথিক সম্পদের খুব অভাব, এ জিনিসটা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতার দরুণ দেশকে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে, অথবা বাজেটের ঘাটতি অর্থসংস্থানের ( Deficit Financing ) আশ্রয় নিতে হতে পারে,—একথাও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর ভিতর এক অর্থনীতিবিদকে খুঁজে পাই, যদিও তাঁর কর্মপরিধি ছিল দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে। তাঁর কর্মপরিধির প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য।

সাত,—দেশের দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে জড়িত আছে বৈদেশিক বাণিজ্য। ইংরেজ শাসনে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে কাঁচামালের রপ্তানিকারক করে রেখে ইংলণ্ডের উৎপাদিত জিনিস ভারতীয় বাজারে ছড়িয়ে রেখেছিল। ভারতের পাটচাষী নামমাত্র মূল্যে তার উৎপাদিত কাঁচা পাট বিক্রি করত চটকল মালিকদের কাছে, এবং চটকলগুলির বিদেশী মালিকরা এবং ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী বিদেশে চটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটত। শিল্প সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের Imperial Preference নীতি এবং অটোয়া চুক্তি ( Ottawa Pact ) দেশের শিল্পগুলিকে কিভাবে বিপর্যস্ত করেছিল

সুভাষচন্দ্র সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন[৫] এবং কিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা আরও উন্নত হতে পারে সে বিষয়ে পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানতেন যে পূর্ণ স্বরাজ লাভ না করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা যাবে না।

সুভাষচন্দ্রের মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ ছিল দেশের একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত লোকের অন্নসংস্থান করা, বস্ত্র সমস্যার সমাধান করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করা,—এই ধরনের কোনো সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ স্বরাজ লাভ না করা যায়। রাজনীতি ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্ণ স্বরাজ লাভ করার আগে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের কথা বলার অর্থ হল ঘোড়ার আগে গাড়ীটিকে এগিয়ে দেওয়া।[৬]

আট,—শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালানোর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কথায় কথায় ধর্মঘট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে ধর্মঘট হওয়া উচিত শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের আমলে কল-কারখানায়

৫। 'The Indian Struggle' বইয়ে সুভাষচন্দ্র অটোয়া চুক্তি এবং ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্সের প্রতি ভারতীয়দের বিরোধিতার কথা বিদেশে প্রচার করার যৌক্তিকতা দেখিয়ে বলেছিলেন. "The world should be informed that India never accepted the Ottawa Pact, but that it was forced down our unwilling throats.'

৬। "Since politics and economics are inextricably bound up together in India—and since British Rule in India exists not only for political domination but also for economic exploitation—it follows that political freedom is primarily an economic necessity to us. The problem of giving bread to our starving millions—the problem of improving the health and physique of the nation—all these problems cannot be solved so long as India remains in bondage. To think of economic improvement and industrial develoment before India is free politically, is to put the cart before the horse." Ibid. pp. 67-68.

শ্রমিকদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা ( bargaining capacity ) ছিল খুবই কম। বিনা নোটিশে শ্রমিক ছাঁটাই হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় আমাদের দেশের কলকারখানাগুলিতে উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। উৎপাদন যাতে কমে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদের আহ্বান জানাতেন। কারণ উৎপাদন কমে গেলে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণ হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়বে। জামসেদপুর ইস্পাত কারখানায় যখন ধর্মঘট হয় তখন সুভাষচন্দ্র তা মেটানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এজন্য যে এটা ছিল একটি ভারতীয় শিল্প। যেহেতু দেশে ইস্পাত উৎপাদন কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় সেজন্য পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যাতে শিল্প বিরোধ মিটিয়ে নেওয়া যায় এবং শ্রমিকদের দাবিগুলি পূরণ করা যায় সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। সুভাষচন্দ্রের আমলেই ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়, দক্ষিণপন্থীরা হুইটলি কমিশনে নিজেদের প্রতিনিধিত্বের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন এবং বামপন্থীরা তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্র হুইটলি কমিশনে ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি যাবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হুইটলি কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার পর তাতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে যতটুকু সুপারিশ ছিল ( তা যতই অল্প হোক না কেন ) সেটুকু গ্রহণ করতে তার আপত্তি ছিল না। দেখা যাচ্ছে, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার স্বার্থেই সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদের আন্দোলন করার আহ্বান জানাননি,—তার কাছে আরও বড় ছিল শ্রমিকদের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ। শ্রমিকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের মতো মজুরি ( living wage ), নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধা ( maternity benefits ) শ্রমিকদের জন্য সর্বপ্রকার সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা ( social security benefits ), কাজের সময় এবং পরিবেশের উন্নয়ন, শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা, কল-কারখানায় অর্জিত মুনাফার একটি অংশ শ্রমিকদের দেওয়া ( Profit Sharing scheme ) এবং শ্রমিকদের বোনাস ও উৎপাদন-ভিত্তিক ভাতা

দেওয়া, প্রভৃতি দাবি পূরণের জন্য সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে সংগ্রাম করে গেছেন। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের কাজের অধিকার ( Right to work ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বেকার-ভাতা প্রবর্তন করার জন্যও তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

নয়,—সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ এবং অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে অদ্ভুত সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, বাদ (thesis) ও প্রতিবাদ ( antithesis ) থেকে যে পবিমাণ বা সমন্বয়ের (synthesis) সৃষ্টি হয়, তা-ই পরবর্তীকালে আবার বাদ ( thesis ) হিসাবে গৃহীত হতে পারে। কারণ, ইতিহাসের গতি কখনই রুদ্ধ হয় না। সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমের ভাল জিনিসটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি-ভাবে মার্কসীয় মতবাদ তিনি গ্রহণ করতে চাননি। অপরদিকে জাতীয় সমাজবাদের (National Socialism) যে জিনিসটি ভাল, যেমন, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা—তাও গ্রহণ করতে তিনি আপত্তি করেননি। তাঁর আদর্শ ছিল ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা, এবং এই সমাজতন্ত্র পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নয়। ভারতীয় পরিবেশ এবং ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তিনি এদেশে একটি সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যার ভিত্তি হবে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম। সাম্য বলতে সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক,—এই তিন প্রকার সাম্যই বুঝতেন। শ্রমিকদের কাজের অধিকার ( Right to work ) স্বাধীন ভারতে সুনিশ্চিত হয়নি। এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। হয়ত ভারতের মত বিরাট দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, শ্রমিকদের কাজের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা খুব কঠিন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের যেভাবে জাতির অর্থানৈতিক পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন, তাতে এই অধিকারের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, এবং এজন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন কমসূচী তৈরি করেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক, এবং পরাধীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক ;

এক্ষেত্রেই আমরা সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে সমন্বয় দেখতে পাই।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন,—তা হল জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা। শিক্ষার সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক খুবই গভীর; সুভাষচন্দ্র এটা জানতেন আজ যখন দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিতর্ক চলছে তখন এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের কী অভিমত ছিল এবং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় ছিল সে বিষয়ে একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দর 'man-making education' সম্পর্কিত ধারণার সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'যা প্রকৃত শিক্ষা তাকেই আমরা 'জাতীয় শিক্ষা' বলি। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার করতে হলে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রথমত, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম ও সমাজ নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নূতন প্রণালীর প্রবর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্য যাতে দূর করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালীই আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে।

"জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আমাদের দেশে আমাদের দেশবাসী কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া চাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে যে শিক্ষা-প্রণালী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে গড়ে উঠেছে তা কোনমতেই জাতীয় শিক্ষা হতে পারে না, কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—বিজ্ঞানে কোনো জাত নেই। তার উত্তরে ঔপন্যাসিকপ্রবর শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—বিজ্ঞানে জাত নেই বটে, কিন্তু culture-এর জাত আছে। আমরা আর একটু এগিয়ে বলতে পারি যে শুধু culture-এ কেন, শিক্ষা-প্রণালীতেও জাত আছে। কারণ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যে শিক্ষা-প্রণালী এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেনা, সে শিক্ষা-প্রণালী কখনো সার্থক বা ফলদায়ক হতে

পারে না।”[৭]

কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি গবেষণার উপর সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঠিকই,—কিন্তু এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, —“শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধের মধ্যে একথা বোধ হয় কেউ-ই অস্বীকার করবেন না যে শুধু cultural training ( অর্থাৎ, সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা ) বা শুধু practical training ( অর্থাৎ অন্ন-সংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষা ) নিয়ে মানুষ হওয়া যায় না, এর যে-কোনো একটিকে একান্ত করে ধরলে একদেশদর্শিতার দোষে আমাদের শিক্ষা বিফল হবে। মনোবৃত্তির বিকাশ শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষাব সঙ্গে হবে, শুধু এইরূপ শিক্ষার প্রবর্তনে এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা যাবে।”[৮] স্বাধীন ভারতে ছাত্রদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ঝোঁক অনেক বেড়েছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারদেরও মধ্যেও উপযুক্ত কাজের সুযোগ পাওয়া বর্তমানে যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে এবং এজন্য কারিগরি শিক্ষা প্রাপ্ত অনেককে বেকারও হতে হয়েছে, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই জিনিসটি ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “···আমাদের দেশে Factory-র সংখ্যা অল্প। শত শত ছাত্র যদি ফ্যাক্টরির উপযোগী শিক্ষা পেয়ে শিক্ষা মন্দির থেকে বেরোয় তবে তারা কাজ পাবে কোথায় ? বহু ফ্যাক্টরি গঠন করা ব্যয় সাপেক্ষ—আমাদের দরিদ্র-দেশে তা সম্ভবপর নয়। আর-এক কথা—আমরা যদি ফ্যাক্টরির বিধিবদ্ধ কর্মপদ্ধতির কাছে আত্মবিক্রয় করি—যে ঘড়ির কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত সময়ের বন্ধনে দাসত্ব করি, ধনীদের কৃপাদত্ত পুরস্কার এবং রোষদৃপ্ত বিরাগের কাছে আত্ম-সম্মান বিকিয়ে দিই, তবে আমাদের দাসভাব ঘুচল কোথায় ?

“কাজেই আমার মনে হয়···যাতে ছাত্ররা অতি অল্প মূলধন নিয়ে আপন আপন গৃহে শিল্পের ( cottage industries ) উন্নতি সাধন করে সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে পারে আমাদের শিক্ষালয়ে সেইরূপ practical training-এর প্রবর্তন হওয়া উচিত। ···এই গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে স্থানীয় অবস্থার উপর।”[৯]

৭। সুভাষ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, ঐ পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১

৮। ঐ পৃষ্ঠা ২৫৩, ৯। ঐ পৃষ্ঠা ২৫৪

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র আখের চাষ থেকে চিনি প্রস্তুত করার প্রণালী, রেশমের চাষ যেখানে হয় সেখানে রেশমের কারখানা করা, উড়িষ্যা ও ভিজাগাপট্টম অঞ্চলে যেখানে নাক্সভোমিকা গাছ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় যেখানে ল্যাবরেটারি খোলা, নারকেলের ছোবড়া থেকে নানা ধরণের জিনিস তৈরী করা এবং হস্তজাত শিল্পের সম্প্রসারণ,—প্রভৃতি ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর ( practical training ) গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থাৎ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি তিনি জোর দিয়েছিলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃত মানুষ হতে পারে তার উপর। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আদর্শের বীজ শিক্ষার্থীর হৃদয়ে বপণ করা হয় তার উপর। সুভাষচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শ নিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভাব-দৈন্যের কারণ কি ? কারণ এই যে যাঁরা আমাদের শিক্ষা দেন তাঁরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপণ করেন না। আমাদের ভাব-দৈন্যের জন্য আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের প্রধানত দায়ী করি।···আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন —তাঁরা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হন—তাহলে ছাত্রদের নিজের চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা মানুষ হতে হবে।"[১০] সুভাষচন্দ্র একথাগুলি বলেছিলেন ১৯২৮ সালে ; বলতে দ্বিধা নেই এখন এই কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। সেজন্য শিক্ষিত বেকারদের তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে নিজেদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্ট সহিষ্ণুতার দ্বারা বেকারদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করতে হবে।

১০। নিখিলবঙ্গীয় যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ( ১১ ডিসেম্বর ১৯২৮ ) —সুভাষ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মারোয়াড়ী ভাইরা যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় কলকাতায় এসে ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল বর্তমান বাঙ্গালী যুবকরাও তা করতে পারবেনা কেন?

শিক্ষাব্যবস্থাসম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার কিছুটা যোগসূত্র রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে পরিকল্পনার যে রূপরেখা সুভাষচন্দ্র তৈরি করেছিলেন তাতে ভারতের যুবকরা যাতে শুধু দেশের ভেতরেই নয় এমনকি জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকেও কারিগরি শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ উত্তরসূরী। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা (যা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তর ভিত্তিশীল) বিবেকানন্দ উপস্থাপিত সমাজতন্ত্রের ধারণারই অনুরূপ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি (অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান), প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারারই বাহক। তবে স্বামীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা বলেননি, —সুভাষচন্দ্র যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই গুরুত্ব আরোপ করার পেছনে যে আদর্শ সুভাষচন্দ্রের প্রেরণার উৎস ছিল তা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দই সুভাষচন্দ্রকে পথ দেখিয়েছিলেন। নিজের মুক্তি নয়, সমগ্র মানব-জাতির মুক্তি, এই আদর্শেই সুভাষচন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, দাসত্ব থেকে ভারতের মুক্তি মানব-জাতির মুক্তিরই একটি অঙ্গ। দেশের গরীব জন সাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্র যে সংগ্রাম করে গেছেন তা তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতবাসীর মধ্যে মুক্তির চেতনা জাগ্রত করা, তাকে মুক্তি সংগ্রামে ও জাতির পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করা, মানব প্রেম এবং স্বাধীনতার আদেশ'কে অবলম্বন করে দেশের কল্যাণ নিজের জীবন উৎসর্গ করা—এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনের ব্রত, এই জীবন-ব্রতের সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

---

## গ্রন্থঋণ


সুভাষ রচনাবলী—প্রথম খণ্ড থেকে পঞ্চম খণ্ড ( জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা )
সুভাষচন্দ্র বসু—The Indian Struggle 1935-1942 ( Chukerborty, Chatterjee, Company Ltd., Calcutta )
Seleted Speeches of Subhas Chandra Bose।

সুভাষচন্দ্র বসু—CROSSROADS ( Netaji Research Bureau )
সুভাষচন্দ্র বসু—An Indian Pilgrim
সুভাষচন্দ্র বসু—কোন্ পথে ? ( কথা ও কাহিনী, কলকাতা )
সুভাষচন্দ্র বসু—তরুণের স্বপ্ন, ( আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা )
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাশিয়ার চিঠি ( রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর ( রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড )
শঙ্করীপ্রসাদ বসু—সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং ( জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা )
শঙ্করীপ্রসাদ বসু—সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর ভবতোষ দত্ত—অর্থনীতির পথে ( জিজ্ঞাসা, কলকাতা )
নন্দ মুখোপাধ্যায়—বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ ( মডার্ন কলাম, কলকাতা )
নন্দ মুখোপাধ্যায়—সুভাষচন্দ্র ও ব্রিটিশরাজ ( মডার্ন কলাম, কলকাতা )
নন্দ মুখোপাধ্যায়—জার্মানীর চোখে নেতাজী ( চারু পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা )
M. N. Gandhi—Non-Violence in Peace and War, Volume II ( Nabajiban Publishing House, Ahmedabad )
Pattavi Sitaramia—History of the Indian National Congress
সুব্রত গুপ্ত—বিবেকানন্দের অর্থ নৈতিক চিন্তা ( মডার্ন কলাম, কলকাতা )